Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৭তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০১৪

মাসিক

আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ১১তম সংখ্যা আগস্ট ২০১৪

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

সত্যের বিজয় অবধারিত

সত্য সেটাই যা আল্লাহ প্রেরিত। আর মিথ্যা সেটাই যা আল্লাহ বিরোধী এবং যাতে প্রবৃত্তির রং মিশ্রিত। সত্য সর্বদা বিজয়ী এবং মিথ্যা সর্বদা পরাজিত। আল্লাহ বলেন, তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে' *(ছফ ৬১/৯)*।

অত্র আয়াতে 'হেদায়াত' ও 'সত্যদ্বীন' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে এবং 'সকল দ্বীন' বলতে ইসলামের বাইরে যুগে যুগে প্রচলিত সকল দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আর 'বিজয়' বলতে আদর্শিক ও রাজনৈতিক উভয় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। রাজনৈতিক বিজয় সর্বত্র সর্বদা না থাকাই স্বাভাবিক। তবে আদর্শিক বিজয় সর্বদা রয়েছে এবং থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আদর্শিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী ছিল। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ইমাম মাহদীর আগমনে পুনরায় বিশ্বব্যাপী সে বিজয় আসবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তবে ইমাম মাহদী আসার আগ পর্যন্ত ইসলাম সর্বদা কুফরী শাসনের অধীনে থাকবে এটা নয়। আল্লাহ বলেন, কাফেররা চায় আল্লাহ্র নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ চান তার নূরকে পূর্ণ করতে। আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না' *(ছফ ৮)*। এর দ্বারা বুঝা যায় মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য চেষ্টিত থাকতে হবে। নইলে তারা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যার পরিণাম হবে জাহান্নাম। নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিজয়ের পথ হবে নবীগণের গৃহীত পথ, অন্য কোন পথ নয়। তাছাড়া আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিজয়কে পৃথক করে দেখার কোন অবকাশ নেই। দু'টিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাত ও পা পৃথক হলেও তা যেমন একই দেহের অঙ্গ। তেমনি ধর্ম ও রাজনীতি বাহ্যতঃ পৃথক হ'লেও তা মানুষের জীবনের দু'টি দিক মাত্র। একটির দ্বারা অপরটি প্রভাবিত।

মুমিনের সার্বিক জীবন তাওহীদের চেতনায় পরিচালিত হয়। জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগে আল্লাহ ব্যতীত সে অন্য কারু দাসত্ব করে না। আর সেই দাসত্বের বিধান সমূহ বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে। যে মুমিন উক্ত দুই উৎসের আলোকে জীবন পরিচালনা করেন, তিনি 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এটি তাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম। তারাই মাত্র ফের্কা নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতের প্রাক্কাল অবধি এই দলের বিজয়ী কাফেলা পৃথিবীর সর্বত্র থাকবে। বিরোধীরা বা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম)*।

আদর্শিক বা রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল তিনটি। ১. লক্ষ্যের স্বচ্ছতা। ২. উপলক্ষ্যের পবিত্রতা। ৩. দৃঢ় নৈতিকতা।

আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং তাতে কোন খাদ নেই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং পরকালে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে। এই লক্ষ্যে ব্যয়িত প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা আখেরাতে মুক্তির অসীলা মনে করি। অতঃপর আমাদের উপলক্ষ্যে এবং উপায়-উপকরণে প্রচলিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নষ্টামির কোন সংশ্রব নেই। সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কোন পন্থা আমরা অবলম্বন করি না। আমরা বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে হক প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্ন দেখিনা। নবীগণ স্ব স্ব যুগে প্রচলিত বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেননি। আমরাও তা করি না। পার্থিব জয়-পরাজয় আমাদের নিকট মুখ্য নয়। পরকালীন মুক্তিই মুখ্য। আর সেটাই হ'ল শ্রেষ্ঠ বিজয়। তবে বাতিলপন্থীরা সর্বদা হকপন্থীদের শত্রু। সেকারণ তাদের হাতে চিরকাল হকপন্থীরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। আমরাও হয়েছি। ইতিমধ্যে যারা বাতিল ছেড়ে হক কবুল করে 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন, তাদের উপরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাতিলের হামলা হচ্ছে। এগুলি বাতিলপন্থীদের অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ এবং আদর্শিক পরাজয়ের লক্ষণ। একদিন তাদের রাজনৈতিক পরাজয়ও ঘটবে ইনশাআল্লাহ। কারণ আদর্শিক বিজয়ের সাথে সাথে আসে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজয়, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

সবশেষে দৃঢ় নৈতিকতা। *আলহামদুলিল্লাহ*। আমাদের কর্মীদের অধিকাংশ এ ব্যাপারে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আমাদের উপর যখন ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার ও বর্বরতম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল, তখনও আমাদের কর্মীরা লক্ষ্য হারায়নি বা নীতিচ্যুত হয়নি। যদিও তৎকালীন সরকারের লেজুড় পার্টি করার জন্য সব ধরনের টোপ ও চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। ভীরু ও দুর্বলচেতা এবং 'আন্দোলন' সম্পর্কে অজ্ঞ বা আধা অজ্ঞ কিছু কর্মী তাতে বিভ্রান্ত হয়ে চলে গিয়েছিল তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থে। এজন্য আমরা দুঃখিত এবং তাদের হেদায়াত কামনা করি। কিন্তু এতে আমরা বিস্মিত নই। কারণ এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। তাছাড়া হক আন্দোলনের জন্য যোগ্য কর্মী আল্লাহ নিজে থেকেই বাছাই করেন। পবিত্র থেকে অপবিত্রদের পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ হকপন্থী মুমিনদের ছাড়বেন না বলে নিজেই ওয়াদা করেছেন *(আলে ইমরান ১৭৯)*।

উপরে বর্ণিত তিনটি শর্ত যদি আমরা অক্ষুণ্ণ রেখে শান্তিপূর্ণ পথে দাওয়াত ও সংগঠন চালিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের ধর্মভীরু অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত অর্থে 'আহলেহাদীছ' হবেন অথবা তাদের সমর্থক হবেন এবং ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তাই এ মুহূর্তে প্রয়োজন ইমারতের অধীনে নিঃস্বার্থ কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ দাওয়াত। সমাজ পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে শহরে-গ্রামে, দেশে ও প্রবাসে সর্বত্র সচেতন কর্মী বাহিনী গড়ে ওঠা আবশ্যক। যাত্রাপথে বাধা থাকবে সেটা ভেবে নিয়েই ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। ভরসা স্রেফ আল্লাহ্র উপরে, ফলাফলও তাঁর হাতে। *নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাৎহুন ক্বারীব (স.স.)*।

উত্তম সমাজ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ– متفق عليه–

অনুবাদ : হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য একটি গৃহের ন্যায়। যার একাংশ অপরাংশকে মযবূত করে'। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করলেন।[১]

হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ 'সকল মুমিন একজন ব্যক্তির মত। যদি তার চোখে কষ্ট হয়, তাহ'লে সারা দেহে কষ্ট বোধ হয়। আর যদি মাথায় ব্যথা হয়, তাহ'লে সারা দেহ ব্যথাতুর হয়'।[২]

একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى 'তুমি ঈমানদারগণকে পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়াশীলতার ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[৩]

উপরোক্ত হাদীছগুলিতে উত্তম সমাজের চিত্র অংকিত হয়েছে। এখানে কেবল মুমিনদের কথা বলা হয়েছে। কেননা তারাই আল্লাহ্র নিকট 'শ্রেষ্ঠ জাতি' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে একই লক্ষ্যের অনুসারী হওয়ায় মুমিন সমাজে এটা সহজেই সম্ভব। তবে কোন সমাজে কেবল মুমিন বাস করে না। বরং কাফির-মুশরিকরাও সেখানে বসবাস করে। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে মুমিনদের আচরণ কেমন হবে, সে বিষয়ে ইসলামের সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে। যদি তারা মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা না করে, তাহ'লে তাদের প্রতি সর্বোচ্চ মানবিক আচরণ করা হবে। কারণ সবাই এক আদমের সন্তান। আদম ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। কিন্তু কাফের-মুশরিকরা তাদের আদি পিতা-মাতার ধর্ম ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। উত্তম উপদেশ ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখানো মুমিনের কর্তব্য। এর জন্য সে নেকী পাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবে।

মানব সমাজ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একদল আল্লাহকে স্বীকার করে ও তাঁর বিধান মেনে চলে। আরেক দল নিজেদের সীমিত জ্ঞান তথা প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের পূজা করে ও যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলে। উভয় দল পৃথকভাবে বা একত্রিতভাবে সমাজে বসবাস করে। উভয় দলের মধ্যেই রয়েছে কট্টরপন্থী, মধ্যপন্থী ও শৈথিল্যবাদী। সবাইকে নিয়েই সমাজ। আর সমাজ নিয়েই মানুষ। প্রত্যেকে একে অপরের মুখাপেক্ষী। তাই সমাজ গঠনের ও তা পরিচালনার জন্য মানুষকে সর্বদা উচ্চতর জ্ঞানী ও শক্তিমানের অনুসারী হ'তে হয়। আর এটা আল্লাহ্রই চিরন্তন ব্যবস্থাপনা। যখন কোন সমাজ ও সমাজ নেতা আল্লাহ্র দাসত্ব করে ও তাঁর বিধান মতে চলে, তখন সেই সমাজ হয় উত্তম সমাজ। আর যখন তার বিপরীত হয়, তখন সেটি হয় নিকৃষ্ট ও শয়তানী সমাজ। তবে যেকোন সমাজে যেকোন সময় একই ব্যক্তি আল্লাহ্র দাসত্ব ও শয়তানের দাসত্ব দু'টিই করতে পারে। সমাজের দায়িত্ব হবে তখন শয়তানী তৎপরতাকে রুখে দেওয়া ও মানবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে উত্তম সমাজ গঠিত হবে। আর উত্তম সমাজ কাঠামোর মধ্যেই উত্তম ব্যক্তি ও পরিবার গড়ে ওঠা সহজ হয়। সমাজের বৃহত্তম রূপ হ'ল রাষ্ট্র। আর রাষ্ট্র সমূহের ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর রূপ হ'ল বিশ্বরাষ্ট্র। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র সবই উত্তম হবে যদি উত্তম নীতিমালা ও উত্তম ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়। আর যদি অনুত্তম নীতিমালা ও অনুত্তম ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়, তবে সেই পরিবার ও সমাজ নষ্ট সমাজে পরিণত হবে। ঐ রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত হবে। যেমন বর্তমান শতাব্দীতে অধিকাংশ রাষ্ট্র কার্যতঃ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

এখানে সমাজকে গুরুত্ব দিচ্ছি একারণে যে, রাষ্ট্র বলি বা বিশ্বরাষ্ট্র বলি, সমাজই তার ভিত্তি। সমাজ যে আক্বীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হবে, রাষ্ট্র সেভাবে পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। কিন্তু এ রাষ্ট্র ইসলামী নীতিতে পরিচালিত হয় না। এর কারণ এখানকার মুসলিম সমাজের অধিকাংশ নেতা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। আবার আলেমগণ ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদত সমূহের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে শত দলে বিভক্ত এবং অনেকে যিদ ও অহংকারে অন্ধ। সেই সাথে সমাজও বিভক্ত। ইসলামের মূল তাওহীদী রূহ, যা পরস্পরকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখে, তা শিথিল হ'তে হ'তে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন

---

১. *বুখারী হা/৪৮১, মুসলিম হা/২৫৮৫, মিশকাত হা/৪৯৫৫ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪।*
৩. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৩।*

মুসলমানেরা তাওহীদের উপরে কুফরীকে স্থান দিচ্ছে। ফলে এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে শয়তান। সে তার যাবতীয় উপায়-উপাদান নিয়ে জান্নাতের রাস্তায় প্রতিরোধ বসিয়েছে আছহাবুল উখদূদের কাহিনীতে রাস্তা বন্ধকারী বিশাল জন্তুটির ন্যায়। শান্তিপ্রিয় অধিকাংশ মানুষ চায় আল্লাহ্‌র উপর নিখাদ ভরসাকারী একদল তরুণ ও তাদের পরিচালনাকারী দৃঢ় ঈমানদার নেতা। আমরা একনিষ্ঠ হৃদয়ে চাইলে আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে তা দিবেন। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থেই আমাদেরকে উত্তম সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। আর তা অবশ্যই হ'তে হবে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান অনুযায়ী। আমরা সেই আলোকে উত্তম সমাজের রূপরেখা নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

উত্তম সমাজের ভিত্তি :

১. উত্তম সমাজের ভিত্তি হবে নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসের উপরে। কেননা দৃঢ় ও নিখুঁত ভিত্তি ব্যতীত নিখুঁত ও মযবূত ইমারত দাঁড় করানো যায় না। ভিত বাঁকা বা দুর্বল হ'লে ইমারত ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সেকারণ সর্বাগ্রে এই বিশ্বাস মযবূত করতে হবে যে, আমরা স্বেচ্ছায় দুনিয়াতে আসিনি। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট মেয়াদ, কর্ম ও রিযিক দিয়ে। যেমন কারখানায় ঔষধ তৈরী হয় নির্দিষ্ট উপাদান, মেয়াদ ও কার্যকারিতা দিয়ে। নিয়ম মাফিক ঔষধ সেবন না করলে ও তার আনুষঙ্গিক বিধান না মানলে যেমন সুস্থ দেহ আশা করা যায় না, তেমনি আল্লাহ্‌র বিধান যথাযথভাবে না মানলে সুস্থ সমাজ আশা করা যায় না। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ তাই সর্বাগ্রে আক্বীদা সংস্কার করেছেন এবং শিরকী আক্বীদার স্থলে তাওহীদী আক্বীদার বীজ বপন করেছেন। যাতে মানুষ মানুষের গোলামী ছেড়ে আল্লাহ্‌র গোলামীর অধীনে সকলে সমানাধিকার ভোগ করে।

স্বার্থপর সমাজনেতা ও তাদের সাথী কায়েমী স্বার্থবাদীরা সকল যুগে সর্বশক্তি নিয়ে নবীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেযুগে ছিল সামন্ততন্ত্র, এ যুগে এসেছে গণতন্ত্র। যার চাইতে বড় প্রতারণা এখন আর নেই। অতীত ও বর্তমানের সকল মন্ত্র-তন্ত্রের সারকথা হ'ল সমাজ বা রাষ্ট্রনেতাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সংসদীয় গণতন্ত্রে দলনেতা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সবকিছু। জনগণের নামে তিনিই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ভোগ করেন। সে যুগে গোত্রীয় নেতা ও সামন্ত প্রভুদের স্বেচ্ছাচারিতা তাদের গোত্রের ছোট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সারা দেশে সরকারী দল ও দলীয় প্রশাসন একচেটিয়া যুলুম চালিয়ে থাকে তথাকথিত ভোটের লাইসেন্স নিয়ে। ইসলামী বিধানে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখানে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইনসভার সদস্য, আদালতের বিচারপতি সবাই আল্লাহ্‌র বিধানের দাসত্ব করতে বাধ্য। আল্লাহ বিরোধী কোন আইন মানতে কোন মানুষ বাধ্য থাকবে না। ফলে সরকারের যুলুম ও শোষণ থেকে এবং আদালতের অন্যায় বিচারের হাত থেকে মানুষ বেঁচে যাবে।

প্রকৃত অর্থে ইসলামী শাসনই হ'ল জনগণের শাসন। এর বিপরীত সবই হ'ল শয়তানী শাসন। যেখানে জনগণের কেবল শোষণ ও বঞ্চনাই লাভ হয়। যে উদ্দেশ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, তা থেকে তারা চিরবঞ্চিত থাকে। আধুনিক বিশ্বের অভিজ্ঞতাই তার বড় প্রমাণ। অতএব জনগণকে নিজেদের স্বার্থেই ইসলামী শাসন নিয়ে আসতে হবে। এজন্য তাদের সামনে মাত্র একটাই পথ খোলা রয়েছে। আর তা হ'ল নিজেদের মধ্যে ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ও তাঁর মাধ্যমে সামাজিক অনুশাসনে অভ্যস্ত হওয়া। অতঃপর এভাবে সাংগঠনিক ইমারতের মাধ্যমে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ইমারত কায়েম করা। এরূপ ইমারত একাধিক হ'লে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ইসলামী বিধি অনুযায়ী দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে সর্বসম্মত নেতা নির্বাচন করতে হবে। যাতে নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়ার সুযোগ না ঘটে। অতঃপর আমীর তার মনোনীত আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিসে শূরা গঠন করবেন। তাদের পরামর্শক্রমে এবং প্রয়োজনে অন্যদের পরামর্শ নিয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজি ও স্বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ঠ জনগণ অবশ্যই নিজেদের দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামী খেলাফতের দিকে ফিরে আসবে। যেমন বিগত দিনে সিরিয়ায় খৃষ্টানরা মদীনা থেকে আগত মুসলিম বাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং স্বধর্মীয় রোমক শাসনকে অগ্রাহ্য করেছিল। এ যুগে ইহূদী-খৃষ্টানদের চালান করা তন্ত্র-মন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আবারও ইসলামী শাসনকে স্বাগত জানাবে নিজেদের স্বার্থেই। আর তা অবশ্যই হবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শাসন। ইসলামের নামে নিজেদের রচিত মাযহাবী শাসন নয়।

২. ইসলামী শরী'আত :

সমাজ গঠিত ও পরিচালিত হবে ইসলামী শরী'আতের আলোকে, যার ভিত্তি হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র উপরে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে সেই নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, 'তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়ম-কানূন শিখে নাও। কেননা আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে মিলিত হ'তে পারব কি-না জানি না'।[৪] আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা উক্ত দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[৫]

---

৪. *নাসাঈ হা/৩০৬২; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮২।*
৫. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬।*

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের আমীরের। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই উত্তম ও সুন্দরতম সমাধান' *(নিসা ৪/৫৯)*। শরী'আত মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং তা সকলের জন্য কল্যাণকর। ইসলামী নেতা তার সমাজের অমুসলিম সদস্যের প্রতি ইসলামী বিধান অনুযায়ী আচরণ করবেন। নিঃসন্দেহে তাতে উক্ত ব্যক্তি অধিকতর উপকৃত হবেন। এরপরেও ধর্মীয় বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন।

৩. শরী'আতের ব্যাখ্যা হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী :

ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষাগারের সরাসরি ছাত্র। কোন অবস্থায় কোন পরিস্থিতিতে তিনি কোন কথা বলেছেন ও কোন কাজ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরাই বড় সাক্ষী। অতএব কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যায় তাঁদের ব্যাখ্যাই সর্বাগ্রগণ্য। অতঃপর জ্যেষ্ঠ তাবেঈন ও মুহাদ্দেছীনের ব্যাখ্যা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। উক্ত মূলনীতি অনুসরণে যেকোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সামাজিক ঐক্য ও সংহতি এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি এর মাধ্যমেই নিশ্চিত হ'তে পারে। যতদিন মুসলিম উম্মাহ উক্ত নীতি মেনে চলেছে, ততদিন তারাই ছিল পৃথিবীর সেরা জাতি। কিন্তু পরে তারা উক্ত নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ায় অধঃপতিত হয়েছে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্ব মানবতা। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে গেলে ফেলে আসা নীতিতেই ফিরে যেতে হবে। যুগে যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে উক্ত পথেই আহ্বান জানিয়েছে। আজও জানিয়ে যাচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য সমূহ :

১. আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব :

উত্তম সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে এই সমাজের লোকেরা সকল কাজে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু দাসত্ব করবে না। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নিশ্চিত করবে। আর এটাই হ'ল তাওহীদে ইবাদত। মানুষের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ প্রেরিত বিধানের অধীনস্ত থাকবে। মানব রচিত আইন কোন অবস্থায় আল্লাহ্র আইনকে চ্যালেঞ্জ করবে না। করলে সেটা হবে শিরক। যার পাপ হবে অমার্জনীয়।

২. নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য :

উত্তম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল আনুগত্যশীলতা। আনুগত্যহীন সংগঠন বা অবাধ্য সমাজ কখনোই উত্তম সমাজ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ-

'মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল কর্মে আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা। যতক্ষণ না কোন পাপকর্মে আদেশ করা হয়। যদি কোন পাপকর্মে আদেশ করা হয়, তাহ'লে কোন আনুগত্য নেই'।[৬]

তিনি বলেন, যদি কেউ তার আমীরের কাছ থেকে অপসন্দনীয় কিছু দেখে, তাহ'লে সে যেন তাতে ছবর করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হ'ল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[৭]

বস্তুতঃ আনুগত্যহীন সমাজ একটি বিশৃংখল ও জংলী সমাজ। আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক সমাজ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরই দুর্গন্ধে ইসলামী সংগঠনগুলিও ক্রমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের মধ্যে এখন আনুগত্যের বদলে অবাধ্যতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বদলে অশ্রদ্ধা ও আত্মম্ভরিতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। যার ফলে ইসলামী সমাজের মূল রূহ হারিয়ে যাচ্ছে। অতএব সংশ্লিষ্টরা সাবধান!

৩. পরামর্শ গ্রহণ :

সমাজ পরিচালনায় যোগ্য ও উত্তম ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। আল্লাহ্র বিধান অপরিবর্তনীয়। সেখানে কোন পরামর্শ নেই। তবে তা বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রয়োজন। যেমন বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধসমূহ ছাড়াও দুনিয়াবী প্রায় সকল কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোগ্য ছাহাবীদের নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'তুমি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি দৃঢ়কল্প হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি কেবল সংগঠন ও সমাজ পরিচালনায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং পরিবার পরিচালনায়ও যরূরী। একক পরিবার হৌক বা যৌথ পরিবার হৌক পরিবার প্রধানকে পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের সাথে পরামর্শ করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্তব্য। তাতে পরিবারের শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে। যদি নেকীর কাজে সিদ্ধান্ত হয়, তবে ঐ পরিবারে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হবে। একইভাবে উক্ত সমাজের উপরেও আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবে, যেখানে সর্বদা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

---

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৮।*

৪. দায়িত্বশীলতা :

উত্তম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা। এই সমাজের প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করবে। তারা কেউ কাউকে অসম্মান করবে না, যুলুম করবে না, লজ্জিত করবে না। এই সমাজের প্রত্যেকের জন্য পরস্পরের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান নিষিদ্ধ। এ সমাজে কেউ অসুস্থ বা পীড়িত হ'লে অন্যের দায়িত্ব পড়ে যায় তাকে সুস্থ করার ও চিকিৎসা করার। প্রাথমিক দায়িত্ব নিজ পরিবারের হ'লেও মূলতঃ এ দায়িত্ব সমাজের। এমনকি একটা পশু বিপদে পড়লেও এ সমাজের মানুষের কর্তব্য হ'ল তাকে উদ্ধার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিগত যুগে একজন বেশ্যা মহিলা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে দেখতে পায়। তখন সে গভীর কূয়ায় নেমে নিজ চামড়ার মোযায় পানি ভরে এনে তাকে খাওয়ায়। তাতে প্রচণ্ড দাবদাহে মৃত্যুর কোলে পৌঁছে যাওয়া কুকুরটি বেঁচে যায়। এতে খুশী হয়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন ও সে জান্নাতবাসী হয়'।[৮] এর বিপরীতে আরেকজন মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে না খেতে দিয়ে কষ্ট দিলে সে মারা যায়। এর ফলে ঐ মহিলা জাহান্নামী হয়।[৯] উত্তম সমাজে পশুর যখন এত সম্মান ও জবাবদিহিতা, সে সমাজে শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষের কেমন মর্যাদা হওয়া উচিত, তা অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*।

বস্তুতঃ উপরোক্ত দায়িত্বশীলতা থেকেই ইসলামে বিধান দেওয়া হয়েছে মযলূমের প্রতিকারে যালেমের জন্য শাস্তি, ধনীর সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টননীতি, তার সঞ্চিত সম্পদে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত ও অন্যান্য নফল ছাদাক্বার বিধান। এতদ্ব্যতীত মানত, কাফফারা, হাদিয়া, আক্বীকা, কুরবানী ইত্যাদি নানাবিধ দানের ব্যবস্থা।

বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বড়দের মর্যাদা বুঝে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না, সে মুসলমানের দলভুক্ত নয়'।[১০] বলা হয়েছে, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন'।[১১] বলা হয়েছে, 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১২]

৮. *বুখারী হা/৩৩২১, মিশকাত হা/১৯০২।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০২।*
১০. *আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩।*
১১. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৯৬৯।*
১২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

এভাবে উত্তম সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এবং একে অপরের জান-মাল ও ইয্যত রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। এর বিনিময় সে আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা কিছু সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পেয়ে যাবে। আর সেটাই হ'ল উত্তম ও মহান পুরস্কার' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২১)*।

৫. উত্তম চরিত্র :

উত্তম সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এ সমাজের সদস্যরা হবেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের কাছে পরস্পরের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তারা একে অপরের নিকট বিশ্বস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সর্বাধিক ভারী হবে তার উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রতি'।[১৩] ব্যক্তি জীবনে তারা চরিত্রবান, ধৈর্যশীল, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হবে। পারিবারিক জীবনে সে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হবে। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি সদাচরণ করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। পুরুষ ও নারী পরস্পরে দৃষ্টি অবনত রাখবে। যথাযথ পর্দা রক্ষা করে চলবে। মায়ের জাতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দিবে। সকল কাজে লজ্জাশীলতা বজায় রাখবে। সামাজিক জীবনে সে পরস্পরকে সালাম করবে, হাসিমুখে কথা বলবে, ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করবে। পারস্পরিক লেনদেনে বিশ্বস্ত থাকবে। ঝগড়ার বিষয়ে আপোষকামী থাকবে। হক্কুল্লাহ আদায়ের ব্যাপারে সদা যত্নশীল থাকবে। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, ছাদাক্বাহ ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহ্‌র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করবে। তার প্রতি সর্বদা ভরসাকারী থাকবে এবং যে কাজ করলে তিনি খুশী হন, সর্বদা সে কাজে অগ্রণী থাকবে। সামাজিক বা রাজনৈতিক দায়িত্ব পেলে সর্বদা অধীনস্তদের প্রতি দয়াশীল থাকবে। পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করবে। অন্যের জান-মাল ও ইয্যতের হেফাযতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। চুক্তি রক্ষা করবে এবং জনকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবে। সবকিছুর বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে উত্তম সমাজ কায়েম হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

১৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮১ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়।*

Contents

হাদীছের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রণয়নে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী :

ভারতের বিহার প্রদেশে অসংখ্য আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা পাঠদান ও গ্রন্থ রচনায় অপরিসীম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী।[14] তিনি ১২৭৩ হিজরীর ২৭শে যিলকদ (১৮৫৭ সালের ১৯শে জুলাই) জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় যুগের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। শেষে ১২৯৬ হিজরীর মুহাররম (জানুয়ারী ১৮৭৯ খ্রিঃ) মাসে মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইনের কাছ থেকে হাদীছের সনদ গ্রহণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুই বার মিয়াঁ ছাহেবের নিকটে যান এবং সর্বমোট আড়াই বৎসর তাঁর দরসের মজলিসে শামিল থাকেন। জ্ঞানার্জনের পর পাঠদানের খিদমত আঞ্জাম দেন এবং গ্রন্থ রচনার সাথেও যোগসূত্র বিদ্যমান থাকে। হাদীছ সম্পর্কে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো শামিল রয়েছে।

১. গায়াতুল মাকছূদ ফী হাল্লি সুনানি আবীদাঊদ : এই নামে সুনানে আবুদাঊদের এমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা লেখার পরিকল্পনা তাঁর ছিল, যা বেশ কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হবে। কিন্তু এর শুধুমাত্র এক খণ্ড দিল্লীর আনছারী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[15] সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে, এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কতদূর পর্যন্ত লেখা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, একুশ পারার ব্যাখ্যা সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এর মাত্র দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি খোদাবখশ পাটনা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। অন্যান্য খণ্ডগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় না।

২. আওনুল মা'বূদ আলা সুনানি আবীদাঊদ : এটিও চারটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত[16] সুনানে আবুদাঊদের শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটিকে 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর সারসংক্ষেপ আখ্যায়িত করা হয়। ৭ বছরে এটির রচনা সমাপ্ত হয় এবং প্রথমবার ১৩১৮-১৩২৩ হিজরী পর্যন্ত ৫ বছরে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ আলেমদের মধ্যে এই গ্রন্থের অপরিসীম গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। উপমহাদেশে এ বিষয়ে এটিই প্রথম হাদীছের খিদমত, যা আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী তৌফিক লাভ করেন।

৩. আত-তা'লীকুল মুগনী আলা সুনানিদ দারাকুতনী : মাওলানা আযীমাবাদী স্বীয় গবেষণালব্ধ টীকা সহ প্রথমবার হাদীছের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দারাকুতনীর 'মতন' (Text) প্রকাশ করেন। ১৩১০ হিজরীতে দিল্লীর ফারূকী প্রেস থেকে এই গ্রন্থটি প্রথম দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর ফটোকপি পাকিস্তানেও মুদ্রিত হয়েছে। তিনি হাদীছ বিষয়ে অনেক খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আমি আমার 'দাবিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে যার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি। এতে তাঁর কিছু খ্যাতিমান ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেছি এবং এটাও লিখেছি যে, তাঁর পরামর্শে কোন আলেম কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাহকীকী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো কতটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী মাত্র ৫৬ বছর আয়ু পান এবং ১৩২৯ হিজরীর ১৯শে রবীউল আওয়ালে তিনি (১৯১১ সালের ২০শে মার্চ) পরপারে পাড়ি জমান।

মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী :

মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর[17] জন্মস্থান আযমগড় যেলার (ইউপি) মুবারকপুর গ্রাম এবং জন্মসন ১২৮২ হিঃ (১৮৬৫ খ্রিঃ)। তিনি অত্যন্ত নরম মনের অধিকারী, আপাদমস্তক বিনয়ী ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক আলেমে দ্বীন ছিলেন। অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। কিছুদিন হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরীর দরসের মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। হাফেয ছাহেব নিজের এই ছাত্রের যোগ্যতায় বিমুগ্ধ ছিলেন এবং তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রিয় শিক্ষকের পরামর্শে তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর খিদমতে হাজির হন এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। এটি ১৩০৬ হিজরীর (১৮৮৯ খ্রিঃ) ঘটনা। ঐ সময় মাওলানা মুবারকপুরী ২৩ বছরের যুবক ছিলেন এবং মিয়াঁ ছাহেবের বয়স ৮৬ বছর অতিক্রম করেছিল। তিনি মিয়াঁ ছাহেবের কাছ থেকে ছহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী এবং সুনানে আবুদাঊদ পুরাপুরি পড়েন। এসব গ্রন্থ ছাড়াও তাফসীর, হাদীছ ও ফিকহের কতিপয় গ্রন্থ তাঁর নিকট পড়েন এবং সনদ গ্রহণ করেন।

মাওলানা মুবারকপুরী বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন এবং অনেক গ্রন্থও লিখেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল তিরমিযীর শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' (تحفة الأحوذى)। উপমহাদেশে তিনিই প্রথম তিরমিযীর ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। এটি চারটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত। ৩৪৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এ গ্রন্থের উপর তাঁর ভূমিকা রয়েছে। যেটি স্বতন্ত্র খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। ভূমিকা সহ তুহফাতুল আহওয়াযী মোট

** পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৪. *শামসুল হক আযীমাবাদী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫।-অনুবাদক*

১৫. *সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, করাচীর হাদীছ একাডেমী থেকে এর মোট ৩ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। -অনুবাদক*

১৬. *আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, মদীনা মুনাউওয়ারাহ থেকে এটি ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক*

১৭. *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, জুন-আগস্ট ২০০৫।-অনুবাদক*

পাঁচ খণ্ড।[১৮] এটি মাওলানা মুবারকপুরীর হাদীছের এমন খিদমত, যার কারণে তিনি উপমহাদেশের আলেমদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ১৩৫৩ হিজরীর ১৬ই শাওয়াল (১৯৩৫ সালের ২২শে জানুয়ারী) মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী :

মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী[১৯] উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর নিকটাত্মীয় ছিলেন। ১৩২৭ হিজরীর মুহাররম মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ খ্রিঃ) মুবারকপুর নামক স্থানে (যেলা আযমগড়) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন মাদরাসার অসংখ্য যোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৩৪৫ হিজরীতে (১৯২৭ খ্রিঃ) 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' (দিল্লী) থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সকল পরীক্ষায় সর্বদা প্রথম হতেন। ফারেগ হওয়ার পর দারুল হাদীছ রহমানিয়ার পরিচালক শায়খ আতাউর রহমান সেখানেই তাঁকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছিলেন। অতঃপর অসংখ্য আলেম ও ছাত্র তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

পাঠদানের পাশাপাশি গ্রন্থ রচনাও করেন। এর সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, 'তুহফাতুল আহওয়াযী' রচনার সময় মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর সাহায্যকারীর প্রয়োজন দেখা দিলে মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানীকেই তাঁর সাহায্যকারী নিযুক্ত করা হয়। অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেন।

হাদীছের গবেষণালব্ধ খিদমতের ব্যাপারে মাওলানা রহমানীর এক বিশাল বড় কীর্তি হল মিশকাত শরীফের শরাহ। যার পুরা নাম 'মির'আতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ' (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)। এই শরাহটি সমাপ্ত না হলেও যতটুকু হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। প্রথমে এই গ্রন্থটি মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর তত্ত্বাবধানে মাকতাবা সালাফিয়া (লাহোর) থেকে লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল। সেই সময় ছাপার এটিই প্রচলন ছিল। অতঃপর এই গ্রন্থটি জামে'আ সালাফিয়া (বেনারস) কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত চমৎকার টাইপে ৯ খণ্ডে প্রকাশ করে। ভারত, পাকিস্তান ও আরব দেশসমূহের ইলমী পরিমণ্ডলে এটি সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। উপমহাদেশে ইলমী ও তাহকীকী দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থটি প্রথম হওয়ার গৌরবের দাবীদার। এর পূর্বে এই ভূখণ্ডে মিশকাতের এ ধরনের শরাহ কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয়নি।

মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ৮৫ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালের ৬ই জানুয়ারী (১৪১৪ হিজরীর ২৩শে রজব) নিজ জন্মভূমি মুবারকপুরে (যেলা আযমগড়) মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী :

এখন মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরীর পিতা মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর অনেক বড় অগ্রগণ্য ইলমী অবদান লক্ষ করুন! তিনি যেসব মুহাদ্দিছের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী ও শায়খ হুসাইন আরব ইয়ামানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী অধিক অধ্যয়নকারী আলেম ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। পাঠদানের পাশাপাশি তাঁর রচনার সিলসিলাও জারি থাকত। ওলামায়ে কেরামের জীবনী সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর 'আখবারে আহলেহাদীছ' (অমৃতসর) পত্রিকায় ১৯১৮ সালের ৩০শে আগস্ট আহলেহাদীছ আলেমদের জীবনী প্রকাশের একটা সিলসিলা শুরু হয়েছিল। ১৯২২ সালের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চার বছর যেটা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে উপমহাদেশের ৮২ জন আহলেহাদীছ আলেমের জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর শুভ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল।

মাওলানা মুবারকপুরী উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। এগুলো ছাড়া তিনি 'সীরাতুল বুখারী' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, পুরো উপমহাদেশে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। উর্দূ ভাষায় এটিই প্রথম গ্রন্থ যাতে বিস্তারিতভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে এবং মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর মর্যাদার সকল দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিদ্বান মহলে এই গ্রন্থটি দারুণ গ্রহণযাগ্যতা অর্জন করেছে। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থও এর মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়। ১৩২৯ হিজরীতে (১৯১১ খ্রিঃ) প্রথমবার 'সীরাতুল বুখারী' প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে ভারতেও প্রকাশিত হয় এবং পাকিস্তানের কতিপয় প্রকাশনীও প্রকাশ করে।

ভারতের একজন বিজ্ঞ গ্রন্থকার ও অনুবাদক ড. আব্দুল আলীম আব্দুল আযীম বাস্তাবী মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর এই উর্দূ গ্রন্থের (সীরাতুল বুখারী) আরবী অনুবাদ করেন। যেটি তাহকীক ও তাখরীজ সহ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরব বিশ্বের আলেমগণ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন।

এটা পরম সৌভাগ্যের কথা যে, উর্দূ ভাষাতে ইমাম বুখারীর

---

১৮. *বৈরূতের দারুল ফিকর থেকে এটি ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক*

১৯. *ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, জুন-সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর ২০১০। -অনুবাদক*

Contents

প্রথম জীবনী লেখার মর্যাদা একজন ভারতীয় আলেম লাভ করেন এবং তার প্রথম আরবী অনুবাদ, তাহকীক ও তাখরীজের মুকুটও একজন ভারতীয় আলেমের মাথায় শোভা পায়।

মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী গ্রন্থ পাঠে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কোন ব্যবসায়ীর নিকট নতুন কোন গ্রন্থ আসলে এবং তিনি সেটা অবগত হলে যেকোন মূল্যে তা ক্রয় করার চেষ্টা করতেন। গ্রন্থের প্রতি এই আকর্ষণ ও ভালবাসাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিন তিনি দিল্লীর জামে মসজিদ এলাকায় দারুল হাদীছ রহমানিয়া থেকে একটি গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য যান। বই ক্রয় করে চাঁদনী চকে ঘণ্টাঘরের নিকটে রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ি এসে পড়ে। যার উপর কোন আরোহী ও চালক ছিল না। দ্রুত ধাবমান ঘোড়াটি মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীকে পিষ্ট করে চলে যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন। সদ্য ক্রীত গ্রন্থটি তাঁর হাতেই ছিল, যার সবুজ রংয়ের টাইটেল তাঁর রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, এই গ্রন্থটি নিজ সবুজ (এবং রক্তের লাল) রং সহ তাঁর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ১৯২৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৩৪২ হিজরীর ১৮ই রজব) এই দুর্ঘটনা ঘটে। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন*।

ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বরকতময় হাদীছের প্রচার-প্রসার নবুঅতের যুগ থেকে অব্যাহত আছে এবং ইনশাআল্লাহ সর্বদা অব্যাহত থাকবে। মানুষেরা নিজেদের জ্ঞান ও অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এই কল্যাণকর কাজে নিমগ্ন থাকবে। বর্তমান যুগে হাদীছের খাদেমদের দীর্ঘ তালিকায় আযমগড় যেলার ড. যিয়াউর রহমান আ'যমীর নাম অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ড. ছাহেব ১৯৪৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ হিন্দুদের আর্য সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ড. ছাহেব মাধ্যমিক পর্যন্ত নিজ গ্রামে শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর আযমগড়ের শিবলী কলেজে ভর্তি হন। যেখানে মাধ্যমিক ক্লাসেরও ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৯ সালে তিনি এই কলেজের হাইস্কুল (শাখা) থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি স্কুল পাশ করে কলেজে ভর্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইত্যবসরে এক বিশাল বড় বিপ্লব তাঁর জীবনের দুয়ারে কড়া নাড়ে। অধ্যয়নের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহই তাঁকে ইসলাম সম্পর্কিত গ্রন্থগুলো পড়তে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এরপরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তিনি মদীনা মুনাউওয়ারায় পৌঁছে যান এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ফারেগ হওয়ার পর সেখানেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আরো অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা সেখানে রাতের খাবার গ্রহণ করি এবং অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। আমার মনে পড়ছে ঐ সময় তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষদের ডীন ছিলেন। এর ৮ বছর পর ২০০৮ সালের ২৯শে জুন মদীনা মুনাউওয়ারাতেই তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। এবারও রাতের খাবার তাঁর বাড়িতেই খাই। ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ ও মাওলানা আব্দুল মালেক মুজাহিদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দু'জন ব্যক্তি এই অকিঞ্চনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রিয়াদ থেকে এসেছিলেন। এঁরা দু'জন রিয়াদে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু আমি রাতে ড. আ'যমীর বাসায় থাকি এবং আমরা দু'জন অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করতে থাকি।

ঐ সময় ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী হাদীছ সম্পর্কে এমন কাজ করছিলেন, যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। তিনি এমন একটি হাদীছের গ্রন্থ সংকলন করছিলেন, যেটি সকল ছহীহ হাদীছকে শামিল করবে। তিনি এই সংকলনের নাম নির্ধারণ করেছিলেন 'আল-জামে আল-কামেল ফিল হাদীছ আছ-ছহীহ আশ-শামেল' (الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل)। ২০০১ সালের জুনের শেষাবধি এর ৯টি বৃহৎ খণ্ড সংকলিত হয়েছিল। যাতে ঈমান, ইলম ও ইবাদত অর্থাৎ ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কিত ছহীহ হাদীছ সমূহ সকল হাদীছ গ্রন্থ থেকে যাচাই-বাছাই করে একত্রিত করা হয়েছিল। এ সকল তথ্য-উপাত্ত সুবিন্যস্ত অবস্থায় তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। ড. ছাহেবের ধারণা এমনটা ছিল যে, অবশিষ্ট খণ্ডগুলো সমাপ্ত হলে সকল ছহীহ হাদীছের সংখ্যা দাঁড়াবে ১২/১৫ হাযার। তিনি ২০০০ সালের দিকে এই কাজ শুরু করেছিলেন এবং ২০১৩ সালে তা সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এমন কাজ যেটা কোন আলেম অদ্যাবধি করেননি। কেবল ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী সেদিকে মনোযোগ দেন এবং ইনশাআল্লাহ বর্তমানে তা সমাপ্তের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে থাকবে।

আমি 'গুলিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে হাদীছের খাদেমদের আলোচনায় ড. ছাহেবের উপর বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু লিখতে পারিনি। বর্তমানে ঐ ধরনের গ্রন্থ 'চামানিস্তানে হাদীছ' গবেষণাধীন রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

এক মহিলার সোনালী কীর্তি :

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও তাঁর ছহীহ বুখারী সম্পর্কিত অত্যন্ত চমৎকার একটি কাজের আলোচনা করা এখানে যরূরী। যেটি করেছেন লাহোরের গাযালাহ হামিদ বাট নাম্নী এক মহিলা। এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সামান্য ভূমিকা।

লাহোরের এক খ্যাতিমান আলেম ছিলেন প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূম। যিনি ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী (১৩২৬ হিজরীর ২৩শে যিলহজ্জ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারে ইলম ও আমলের অনন্য সম্মিলন পাওয়া যেত। তিনি

আরবীতে এম.এ করেন এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুকাল পর তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৪৭-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি লাহোর সরকারী কলেজে আরবী সাহিত্য পড়াতে থাকেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের সিনিয়র সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৪৮ সালের ২৪শে জুলাই 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ' নামে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ জামা'আতের সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করলে প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূমকে এর সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়। আর মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভীকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। প্রফেসর ছাহেব ১৯৮৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূমের পুত্র মেজর যুবায়ের কাইয়ূম মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন সমবেদনা জানানোর জন্য আমাকে তাঁর বোন গাযালাহ হামিদ বাটের বাড়িতে নিয়ে যান। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে মুহতারামা গাযালাহ বলেন, তিনি ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবীতে এম.এ করেছিলেন এবং 'শুরূহে ছহীহ বুখারী' (شروح صحيح بخاري) শিরোনামে এম.এ থিসিস করেছিলেন। আমি একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। আমি সেই সময় 'ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়াহ'-এর সাথে জড়িত ছিলাম। ইদারার পক্ষ থেকে আমি ঐ থিসিসটি গ্রন্থাকারে ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থসমূহ লেখার সূচনা কবে হয়েছিল এবং কোন কোন আলেম এই বরকতপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন, সম্মানিতা লেখিকা বিস্তারিতভাবে তা আলোচনা করেছেন। উপমহাদেশে এটি ব্যতিক্রমধর্মী কাজ, যেটি লাহোরের প্রাচীন আহলেহাদীছ পরিবারের যোগ্য মহিলা অত্যন্ত গবেষণা করে লিখেছেন। এতে ছহীহ বুখারীর দু'শর অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিচিতি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আমি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছি।

মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী :

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী[২০] প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। যিনি অবস্থার চাহিদা অনুপাতে শিক্ষকতা ও বক্তৃতা প্রদানের সাথে সাথে গ্রন্থ রচনার সিলসিলাও অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ১৯০৯ সালের আগে-পরে ভূজিয়ান (যেলা অমৃতসর, পূর্ব পাঞ্জাব) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেসকল শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহমান ভূজিয়ানী, মাওলানা আব্দুল জাব্বার খান্ডিলবী, মাওলানা আবু সাঈদ শারফুদ্দীন দেহলভী, উসতাযে পাঞ্জাব মাওলানা আতাউল্লাহ লাক্ষাবী ও হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর নাম উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর কাছ থেকে অনেক আলেম ও ছাত্র জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সুনানে নাসাঈর হাশিয়া বা পাদটীকা 'আত-তা'লীকাতুস সালাফিয়্যাহ' (التعليقات السلفية) অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ এই গ্রন্থের দারুণ সুখ্যাতি দান করেছেন এবং অসংখ্য আলেম এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে মাওলানা আতাউল্লাহ পাঞ্জাবের প্রথম আলেম, যিনি আরবী ভাষায় কুতুবে সিত্তাহর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সুনানে নাসাঈর আরবীতে টীকা লিখেছেন।

মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী ১৯৮৭ সালের ৩রা অক্টোবর (১৪০৮ হিজরীর ৯ই ছফর) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সারা জীবন সাদাসিধে ও ইলমের খিদমতে অতিবাহিত করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবায :

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবাযের পাঠদান ও গ্রন্থ রচনাগত খিদমতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি ১৯৩৪ সালে ফিরোযপুর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব, ভারত) 'চক বধুকে' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার সহ ঐ এলাকার সকল মানুষ লাক্ষাবী আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং দ্বীনী মাসায়েল বুঝার জন্য তাঁদের নিকটেই প্রত্যাবর্তন করতেন। মুহাম্মাদ আলী জানবায 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' ফারেগ মাওলানা মুহাম্মাদ রহমানীর নিকট নিজ পিতৃপুরুষের গ্রামে (চক বধুকে) জ্ঞানার্জন শুরু করেন। ভারত ভাগের সময় এরা নিজ জন্মস্থান ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং লায়েলপুর যেলার (বর্তমানে ফায়ছালাবাদ) এক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ঐ সময় মুহাম্মাদ আলী জানবাযের বয়স ছিল ১৩ বছর। পাকিস্তানে তিনি বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। যাঁদের মধ্যে হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালে তিনি জামে'আ সালাফিয়া (ফায়ছালাবাদ) থেকে ফারেগ হন এবং এখানেই ছাত্রদেরকে পড়াতে শুরু করেন। এরপরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তিনি শিয়ালকোটে চলে যান এবং সেখানে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকেন। ওখানে 'জামে'আ রহমানিয়া' নামে মাদরাসাও চালু করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবায দরস-তাদরীসের পাশাপাশি লেখালেখিও করেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে নিজেই প্রকাশ করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা হল সুনানে ইবনু মাজাহ্র শরাহ বা ব্যাখ্যা 'ইনজাযুল হাজাহ' (انجاز الحاجة)। আরবী ভাষায় রচিত এই শরাহটি ১২ খণ্ডে ও ৭৩৯১ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত। নিঃসন্দেহে এটি এ বিষয়ে এক অতুলনীয় শরাহ। আরো কতিপয় আলেম সুনানে ইবনু মাজাহ্র শরাহ লিখেছেন, কিন্তু কলেবর ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই শরাহটি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেটি উপমহাদেশের পাঞ্জাব প্রদেশের এই আলেম লিখেছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবায ১৪২৯ হিজরীর ১৫ই যিলহজ্জ (২০০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর) শিয়ালকোটে

২০. *আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, মে ২০০৫। - অনুবাদক*

Contents

মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর জানাযায় শরীক ছিলাম। আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের ছোট ভাই প্রফেসর ড. ফযলে ইলাহী তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান।

মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলাবী :

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবাযের পূর্বে আরবী ভাষায় 'মিফতাহুল হাজাহ' (مفتاح الحاجة) নামে ইবনু মাজাহ্র হাশিয়া বা পাদটীকা লিখেছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলাবী পাঞ্জাবী। তিনি ১৩১২ হিজরীর ১০ই জুমাদাল উলা (১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর) এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করেন। তিনি অত্যন্ত নেক্কার ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম ছিলেন। মূলতঃ তিনি হাযারা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য) চলে গিয়েছিলেন এবং জীবনের বৃহদাংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন। প্রায় ৮০ বছর আয়ু পেয়ে ১৩৬৬ হিজরীর (১৯৪৭ খ্রিঃ) দিকে মৃত্যুবরণ করেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানীর নিকট ইলমে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে মুসনাদে আহমাদের উর্দূ অনুবাদ এবং অন্যান্য গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড শামিল রয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলাবী পাঞ্জাবী লিখিত এই হাশিয়া সম্মানিত টীকাকারের জীবদ্দশায় প্রথমবার ১৩১৫ হিজরীতে (১৮৯৭ খ্রিঃ) লক্ষ্ণৌতে সুনানে ইবনে মাজাহ্র সাথে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয়বার ১৩৯৪ হিজরীর জুমাদাল উলাতে (জুন ১৯৭৪ খ্রিঃ) 'ইদারাহ ইহইয়াউস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ', ডি ব্লক, সারগোধা, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়বারও এই প্রতিষ্ঠানই ১৩৯৮ হিজরীর মুহাররম মাসে (জানুয়ারী ১৯৭৮ খ্রিঃ) প্রকাশ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেন 'ইদারাহ ইহইয়াউস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' (সারগোধা)-এর পরিচালক মাওলানা আবুস সালাম মুহাম্মাদ ছিদ্দীক।

হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী :

শায়খুল হাদীছ মুফতী হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী পাকিস্তানের তাদরীসী ও তাছনীফী (পাঠদান ও গ্রন্থ রচনা) পরিমণ্ডলে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এক নাম। প্রথমতঃ তিনি হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ীর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানকার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ফারেগ হওয়ার পর হাফেয আব্দুর রহমান মাদানীর 'জামে'আ রহমানিয়া'-তে (লাহোর) শায়খুল হাদীছ হিসাবে খিদমত আঞ্জাম দিতে শুরু করেন।

তিনি নিজেও 'মারকাযু আনছারিস সুন্নাহ' নামে একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ফারেগ হওয়া পরিশ্রমী ছাত্রদেরকে পাঠদান, লেখনী ও বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যদিও সেখানে অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উন্নত প্রতিষ্ঠান এবং লাহোরে এ বিষয়ে এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। এর কার্যক্রম দেখে অনুমিত হয় যে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি উন্নতি করবে এবং এর অনেক সুফল দৃশ্যমান হবে। ইলমের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানীকে আমলের গুণেও গুণান্বিত করেছেন।

সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর ফৎওয়াসমূহ প্রকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। 'ফাতাওয়া মাদানিয়াহ ছানাইয়াহ' নামে তাঁর ফৎওয়া সমষ্টির এক খণ্ড আমাদের প্রিয় বন্ধু মাওলানা কারী আব্দুশ শুকূর মাদানী নিজ প্রকাশনা সংস্থা 'দারুল ইরশাদ', ২১৪ বি, সাবযাহ যার স্কীম, লাহোর থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করছেন। মূলতঃ এখানে এটা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য যে, মুফতী হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী 'জায়েযাতুল আহওয়াযী' (جائزة الأحوذى) নামে ৪ খণ্ডে জামে তিরমিযীর শরাহ লিখেছেন। হাফেয ছাহেব পাঞ্জাব প্রদেশের প্রথম আলেম, যিনি আরবী ভাষায় এই বিশাল বড় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

হাফেয ছাহেব এখন আরবী ভাষায় ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লিখছেন। অদ্যাবধি অনেক আলেম ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ করেছেন এবং খুব সুন্দরভাবে করেছেন। হৃদয়ের গভীর থেকে ঐ সকল আলেমের শুকরিয়া আদায় করছি যে, তাঁরা এদিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং হাদীছের এই মর্যাদাপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে উর্দূভাষীদেরকে নবী (ছাঃ)-এর হাযার হাযার হাদীছ ও অগণিত নির্দেশনার সাথে পরিচিত করানোর বরকতপূর্ণ চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। আল্লাহই তাদেরকে এই কল্যাণকর কাজের প্রতিদান দানকারী এবং ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তিনি তা দিবেন। কিন্তু আরবী ভাষায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে উপমহাদেশের হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যিনি পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর মহানগরীর বাসিন্দা। দো'আ রইল আল্লাহ যেন তাঁকে এই বিশাল বড় কাজ সমাপ্ত করার তৌফিক দান করেন।

(ক্রমশঃ)

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৮ম কিস্তি)

মীলাদপন্থীদের দলীলের জবাব

প্রচলিত প্রত্যেকটি বিদ'আতের পিছনেই কিছু না কিছু দলীল লক্ষ্য করা যায়। অথচ যাচাই করলে সেগুলো যঈফ, জাল অথবা ছহীহ দলীলের অপব্যাখ্যা বলে প্রমাণিত হয়। দুষ্টমতি একশ্রেণীর আলেম এ সমস্ত দলীল অথবা যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ব্রেইন ওয়াশ (মগজ ধোলাই) করে। উদ্দেশ্য হ'ল তাদের দল ভারী করা এবং মানুষের পকেট ছাফ করে তাদের ব্যবসাকে মযবূত করা। 'ঈদে মীলাদুন্নবী' জায়েয করার জন্য অনুরূপই কিছু দলীল অথবা যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে তার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হল।

প্রথম দলীল : হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ، فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوْا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমন করে দেখলেন যে, ইহুদীরা আশূরার দিন ছিয়াম পালন করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের ছিয়াম? তারা বলল, এটি একটি উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর (ফেরাউন) কবল হ'তে মুক্তি দান করেন। ফলে এদিনে মূসা (আঃ) ছিয়াম পালন করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আঃ)-এর অধিক হক্বদার। অতঃপর তিনি এদিনে ছিয়াম পালন করেন এবং ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন।[21] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رضى الله عنه قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ-

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদীরা আশূরার দিনকে ঈদ (উৎসবের দিন) মনে করত। নবী (ছাঃ) বললেন, 'তোমরাও এদিনে ছিয়াম পালন কর'।[22]

উল্লিখিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিধায় এদিনে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য নিজে ছিয়াম পালন করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি মূসা (আঃ)-এর মুক্তির শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম পালন করা বৈধ হয়, তাহ'লে মুহাম্মাদ (ছাঃ); যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর দুনিয়ায় আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ ছালাত, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াতের মত ভাল আমলের মাধ্যমে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপন করাও শরী'আত সম্মত।

জবাব : প্রথমতঃ যেকোন ইবাদত করার প্রথমে দু'টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (ক) এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। (খ) এমন ইবাদত করতে হবে, যা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি দ্বারা স্বীকৃত এবং নিজেদের খেয়াল-খুশী মত ইবাদত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ- إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ-

'এরপর আমরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। আল্লাহ্র মুকাবিলায় তারা তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ তো মুত্তাক্বীদের বন্ধু' *(জাছিয়া ৪৫/১৮-১৯)*।

সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধানের বাইরে কোন বিধানকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব মনে করা কোন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণ করাই মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যাচারী পাপিষ্ঠ ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ নিজে ছিয়াম পালন করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে পালন করতে বলেছেন। কিন্তু তিনি কি কখনো 'রহমাতুল্লিল আলামীন' হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ জন্ম দিবস পালনের নামে কোন ইবাদত করেছেন? কিংবা ছাহাবায়ে কেরামকে করতে বলেছেন? যদি ইসলামী শরী'আতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী'-এর সামান্যতম ফযীলত থাকত, তাহ'লে অবশ্যই তিনি উম্মতের সামনে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলে যেতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন, যারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, দীর্ঘ ৩০টি বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ জন্ম দিবস পালন করেননি। তাহ'লে কি তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝেননি? কিংবা জন্ম দিবস পালন না করে তারা তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*
২১. *বুখারী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৩৪।*
২২. *বুখারী হা/২০০৫।*

করেছেন? নাঊযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন-আমীন!

দ্বিতীয় দলীল : হাদীছে এসেছে,

قال عروة : وثويبة مولاة أبي لهب. وكان أعتقها حين بَشَّرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرضَعَتْ رسوْلَ الله صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب كافرا، رآه العباس في المنام بعدما أسلمَ العباسُ بشرِّ حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق خيرا بعدكم، غير أني سُقيت كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة قال : وقال أبو عيسى : وكانت ثويبة حاضنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم–

উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের সুখবর দিলে তার দাসী ছুয়াইবাহকে আবু লাহাব মুক্ত করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনিই (ছুয়াইবাহ) রাসূল (ছাঃ)-কে দুধপান করিয়েছিলেন। অতঃপর যখন আবু লাহাব কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, তখন আব্বাস (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরে স্বপ্নে আবু লাহাবকে চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় দেখলেন। আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি দেখছ? সে বলল, তোমাদের পরে আমাকে কল্যাণকর কিছুই প্রদান করা হয়নি। তবে ছুয়াইবাহ্কে মুক্ত করার জন্য আমি প্রত্যেক সোমবার রাত্রে পান করছি। আবু ঈসা বলেন, ছুয়াইবাহ রাসূল (ছাঃ)-এর লালনকারীণী ছিলেন।[২৩]

কুফরীর চরম সীমায় উপনীত আবু লাহাব; যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা 'সূরা লাহাব' নামক একটি সূরা নাযিল করেছেন। এমন কাফেরকে শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশি হয়ে তার দাসী মুক্ত করার কারণে যদি আল্লাহ জাহান্নামে পানি পান করিয়ে থাকেন, তাহ'লে একজন মুসলিম রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনে খুশি হয়ে তাঁর জন্ম দিবস উপলক্ষে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপন করলে আল্লাহ তার উপর অত্যধিক খুশি হবেন।

জবাব : উল্লিখিত দলীলের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যেতে পারে। (১) উল্লিখিত খবরটি মুরসাল; যা উরওয়াহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন তা বলেননি। তাছাড়াও এটি সাধারণ মানুষের দেখা একটি স্বপ্নের ঘটনা, যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[২৪]

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশি হয়ে আবু লাহাব তার দাসী ছুয়াইবাকে মুক্ত করেছিল মর্মে বর্ণনাটি সঠিক নয়। বরং আবু লাহাবের দাসত্বে থাকা অবস্থাতেই ছুয়াইবাহ রাসূল (ছাঃ)-কে লালন করেছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাকে বিক্রি করার জন্য আবু লাহাবকে অনুরোধ করলে তাতে সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের পরে আবু লাহাব ছুয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিল।[২৫]

(৩) আবু লাহাব একজন প্রসিদ্ধ কাফের। আর কাফেরের কোন ভাল আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا–

'আমরা তাদের (কাফেরদের) কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ–

'তাদের (কাফেরদের) দান গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, ছালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করে' *(তাওবা ৯/৫৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ–

'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের আমল সমূহের উপমা ভস্মসদৃশ, যা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি' *(ইব্রাহীম ১৪/১৮)*। অতএব আবু লাহাব উল্লিখিত আয়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। পার্থিব জীবনের ভাল কাজ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না।

(৪) আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট বাণী হ'ল যে, কাফেরদের থেকে কখনোই আযাব হালকা করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا–

'যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোন ফায়ছালা দেওয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না' *(ফাতির ৩৫/৩৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ– خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ–

২৩. *ইবনুল আছীর, জামেউল উছূল ফী আহাদীছির রাসূল হা/৯০৩৬।*
২৪. *ফাৎহুল বারী ৯/১৪৫।*
২৫. *ইবনুল আছীর, আল-কামেল ফিত তারিখ ১/১৫৭; ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২/৪৪৫; ত্বাবারী, যাখায়েরুল উকবা ১/২৫৯; ফাৎহুল বারী ৯/১৪৫।*

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের লা'নত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৬১-১৬২)*।

অতএব আবু লাহাবের আযাব কিভাবে হালকা হ'তে পারে যে রাসূল (ছাঃ) ও ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ছিল। যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন,

تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ- مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ- سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ- وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ- فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ-

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনই কাজে আসেনি। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকানো রজ্জু' *(লাহাব ১১১/১-৫)*।

তৃতীয় দলীল : রাসূল (ছাঃ)-কে সপ্তাহের প্রতি সোমবারে ছিয়াম পালনের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ 'এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুওত প্রাপ্ত হয়েছি। অথবা আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[২৬] বুঝা গেল, রাসূল (ছাঃ) নিজেই তাঁর দুনিয়ায় আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ প্রত্যেক সোমবার ছিয়াম পালন করতেন। অতএব আমরাও বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর জন্ম দিবস পালন করতে পারি।

জবাব : উল্লিখিত দলীলের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যেতে পারে। (১) মীলাদপন্থীদের উদ্দেশ্য যদি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম গ্রহণের শুকরিয়া আদায় করাই হয়, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় প্রত্যেক সোমবার ছিয়াম পালন করতে হবে। কিন্তু তারা কি তা করে? কখনোই নয়। বরং তারা রাসূল (ছাঃ)-এর এই সুন্নাতকে উপেক্ষা করে বছরের একটি দিন ১২ই রবীউল আউয়ালকে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করেছে, চাই তা সোমবার অথবা অন্য কোন দিন হোক। অথচ রাসূল (ছাঃ) ১২ই রবীউল আউয়ালে জন্ম গ্রহণ করেছেন মর্মে কোন দলীল নেই। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম সোমবার দিন ছিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু ১২ রবীউল আউয়ালে কোন কিছুই করেননি। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে উপেক্ষা করার নাম তাঁকে ভালবাসা নয়; বরং তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের নাম তাঁকে ভালবাসা।

(২) রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সোমবারের দিন ছিয়াম পালন করেননি। বরং অন্য একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হ'ল, সপ্তাহের দু'টি দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ্র নিকট বান্দার সাপ্তাহিক রিপোর্ট পেশ করা হয়। আর রিপোর্ট পেশ করার দিনে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় থাকাকে অধিক ভালবাসতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল পেশ করা হয়। অতএব আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করার সময় ছিয়াম অবস্থায় থাকাকে আমি অধিক ভালবাসি'।[২৭]

(৩) রাসূল (ছাঃ) সোমবারে ছিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু তিনি কি তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন? তিনি কি ছাহাবায়ে কেরাম কে নিয়ে কোন জালসা মাহফিল এবং ভাল খাবারের আয়োজন করেছেন? তিনি কি কোন আনন্দ মিছিল করেছেন? কখনোই নয়। তাহ'লে কি জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাহাবায়ে কেরাম, উম্মাহাতুল মুমিনীন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ), হাসান-হুসাইন (রাঃ) তাঁরা কি রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতেন না? অথবা তাঁর আগমনে তাঁরা কি আনন্দিত ছিলেন না? মীলাদপন্থীরা কি তাঁদের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে বেশী ভালবাসেন? তাহ'লে মীলাদপন্থীদের এ কেমন ভালবাসা যার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে উপেক্ষা করা হয়? অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত ভালবাসা অর্জিত হবে তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ-

'বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ তো কাফেরদেরকে পসন্দ করেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩১-৩২)*।

চতুর্থ দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

২৬. *মুসলিম হা/১১৬২, 'প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ।*

২৭. *তিরমিযী হা/৭৪৭; নাসাঈ হা/২৩৫৮; মিশকাত হা/২০৫৬।*

'আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা ও তাঁর প্রতি সালাম জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই উদ্দেশ্যেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপিত হয়।

জবাব : সম্মানিত পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত অনেক বেশী। যেমন তিনি বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, এর প্রতিদানে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন'।[২৮]

অতএব মানুষ বেশী বেশী রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক গুণে বেশী দরূদ পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁরা কি কখনো কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে দরূদ পাঠ করেছেন? করেছেন কি কোন দরূদ পাঠের মিছিল? তাহ'লে আমাদের এ কেমন নবী প্রেম যে, প্রতিনিয়ত দরূদ পাঠের পরিবর্তে বছরের একটি দিনকে বেছে নিলাম দরূপ পাঠের জন্য? আনুষ্ঠানিকতার নাম নবী প্রেম নয়; বরং একান্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের নাম নবী প্রেম। তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার নাম নবী প্রেম নয়; বরং তাঁর মর্যাদার স্থানে তাঁকে রাখাই নবী প্রেম। নিজের মন মত দ্বীন পালনের নাম নবী প্রেম নয়; বরং তাঁর আনীত দ্বীনকে সামান্যতম পরিবর্তন ছাড়াই পালনের নাম নবী প্রেম।

পঞ্চম দলীল : সারা দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমানের নিকট 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উত্তম বলে বিবেচিত। আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ-

'মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা উত্তম আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও তা উত্তম। আর মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা নিকৃষ্ট আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও তা নিকৃষ্ট'।[২৯]

জবাব : প্রথমতঃ উল্লিখিত আছারটি মারফূ' সূত্রে ছহীহ না হওয়ায় দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন,

تفرد به النخعي، قال أحمد بن حنبل كان يضع الحديث، وهذا الحديث إنما يعرف من كلام بن مسعود-

'এই হাদীছটি নাখ'ঈ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, তিনি (নাখঈ) হাদীছ জাল করতেন। আর এই হাদীছটি ইবনু মাসউদের বক্তব্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে'।[৩০] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن هذا ليس من كلام رسول الله وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله-

'এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নয়। হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এটাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। বরং এটা ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর উক্তি হিসাবে প্রমাণিত'।[৩১] আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود-

'মারফূ' সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং এটা ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে 'মাওকূফ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে'।[৩২]

দ্বিতীয়তঃ আছারটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

'রাসূল যা তোমাদের দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ- 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩৩] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً 'সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তাকে উত্তম মনে করে'।[৩৪]

অতএব মুসলমানরা যা উত্তম মনে করবে তা কখনোই উত্তম হ'তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ স্বীকৃত না হবে। বরং সে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

'বল, আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দেব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

[চলবে]

২৮. *মুসলিম হা/৪০৮; মিশকাত হা/৯২১।*
২৯. *মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬০০; সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩।*
৩০. *আবু উসামাহ্ সালীম বিন ঈদ আল-হিলালী আস-সালাফী, আল-বিদ'আতু ওয়া আছারুহুস সায়্যি ফিল উম্মাহ্, পৃঃ ৬০।*
৩১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফুরূসিয়্যাহ, পৃঃ ৬১।*
৩২. *সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৩৩. *মুসলিম হা/১৭১৮।*
৩৪. *সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ্ হা/১২১; আলবানী, সনদ ছহীহ, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ১/৮৩ পৃঃ।*

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমান

*হাফেয আব্দুল মতীন**

ঈমান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ঈমান ব্যতীত মানুষ তার কোন সৎ আমলের প্রতিদান পরকালে লাভ করতে পারবে না। আবার ঈমানহীন মানুষ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে চিরকাল। তাই ঈমানকে ইসলামের মূল খুঁটি বললেও অত্যুক্তি হবে না। এ নিবন্ধে ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

ঈমানের আভিধানিক অর্থ : ঈমানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, নিরাপত্তা দেওয়া, আশঙ্কা মুক্ত করা। এর বিপরীত হচ্ছে ভয়-ভীতি।[৩৫] রাগেব আল-ইছফাহানী বলেন, ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া।[৩৬] শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে।[৩৭]

ঈমানের শারঈ অর্থ : পারিভাষিক অর্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট ঈমান হল মূল ও শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। প্রথম দু'টি মূল ও শেষেরটি হ'ল শাখা, যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।[৩৮]

ঈমানের শারঈ অর্থে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যখনই সে পাঁচটি বিষয় তার জীবনে বাস্তবায়ন করবে তখনই সে একজন ঈমানদার ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে, নচেৎ নয়।

(১) অন্তরের কথা অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ-

'যারা সত্যসহ উপস্থিত হয়েছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাক্বী, তারা যা চাইবে সব কিছুই আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান' *(যুমার ৩৯/৩৩-৩৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ 'এমনিভাবেই আমিই ইব্রাহীমকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়' *(আন'আম ৬/৭৫)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا- 'তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না' *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*।

মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাসে কোন সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে'।[৩৯] হাদীছের অর্থ এই নয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে বসে থাকবে। বরং অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল দ্বারাই একজন মুমিন হওয়া যাবে, নচেৎ নয়। যা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দ্বারা বুঝা যায়।

(২) মুখে উচ্চারণ অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্র মুখে স্বীকৃতি প্রদান করা, উচ্চারণ করে পড়া এবং আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ-

'তোমরা বল, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা ও ঈসা-কে যা প্রাদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রভু হ'তে যা দেয়া হয়েছিল। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৩৬)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا 'যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি। এটা আমাদের প্রতিপালক হ'তে আগত সত্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৩)*। তিনি আরো বলেন, وَقُلْ

---

* *লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৩৫. *জাওহারী, আছ-ছিহাহ ৫/২০৭১; ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত, পৃঃ ১১৭৬।*
৩৬. *আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৩৫।*
৩৭. *আছ-ছারেম আল-মাসলূল, পৃঃ ৫১৯।*
৩৮. *ইবনু মান্দাহ, কিতাবুল ঈমান ১/৩৩১; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৯৭।*
৩৯. *বুখারী হা/৪৪।*

آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ 'বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি' *(শূরা ৪২/১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 'তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত' *(যুখরুফ ৪৩/৮৬)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(আহক্বাফ ৪৬/১৩)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আর ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন হক থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্‌র উপর অর্পিত'।[৪০] উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট হ'ল যে, ঈমান অর্থ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ ও তদনুযায়ী আমল করা। এই তিনটি বস্তুর সমন্বয়েই খাঁটি মুমিন হওয়া যাবে, নচেৎ নয়।

(৩) অন্তরের আমল অর্থাৎ নিয়ত করা। কারণ সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাছ থাকা। কারণ ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। ভালবাসা, আনুগত্য, আশা-ভরসা ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌র জন্য হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 'আর যেসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে ঠেলে দিও না' *(আন'আম ৬/৫২)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়, বরং তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়' *(লাইল ৯২/১৯-২০)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

'নিশ্চয় মুমিনরা এরূপ যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেই আয়াত সমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে' *(আনফাল ৮/২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ 'এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে- এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে' *(মুমিনূন ২৩/৬০)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে এবং অন্যান্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাংখা, বিনয়-নম্রতা, আল্লাহ্‌র দিকে রুজূ হওয়া ইত্যাদি অন্তরের আমল।

(৪) জিহ্বা বা মুখের মাধ্যমে আমল। কুরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, তাকবীর, দো'আ-ইস্তেগফার ইত্যাদি মুখের ইবাদত। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ-

'যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই' *(ফাতির ৩৫/২৯)*। তিনি আরো বলেন, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ 'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউই নেই' *(কাহফ ১৮/২৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর' *(আহযাব ৩৩/৪১-৪২)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

এসব দলীল এবং অন্যান্য আরো দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুখের মাধ্যমে উচ্চারণ করে বা পড়ে যেসব আমল করা হয় তা সবই মৌখিক ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে।

(৫) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা। রুকূ-সিজদা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা, মসজিদের দিকে ছালাতের জন্য রওয়ানা হওয়া, হজ্জ আদায় করা, ছিয়াম পালন করা, আল্লাহ্‌র দ্বীন সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি যত

৪০. বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২২।

প্রকার আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা করা হয় সবই এর মধ্যে শামিল হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'বিনীতভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে (ছালাতে) দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত' *(হজ্জ ২২/৭৭-৭৮)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَاماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً-

'আর রহমানের বান্দা তারাই যারা (আল্লাহ্র) যমীনে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম (শান্তি)। আর তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় ও দণ্ডায়মান হয়ে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৪)*। এ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আরো অনেক দলীল বর্ণিত হয়েছে।[৪১]

ইমাম মুহাম্মাদ হুসাইন আল-আজুর্রী বলেন, ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা। সুতরাং যার মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে সে প্রকৃত ঈমানদার। এরপর তিনি বলেন, জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের উপর রহম করুন! মুসলমানদের আলেমগণ যে কথার উপর অটল আছেন সেটা হ'ল, ঈমানের (অর্থ হচ্ছে) অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা সকল সৃষ্টির উপর ওয়াজিব। অতঃপর তিনি বলেন, জেনে রেখ, অন্তরের বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তার সাথে মুখের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করবে। সুতরাং যার মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেই প্রকৃত ঈমানদার হ'তে পারবে। আর এর উপরেই কুরআন ও হাদীছের দলীল এবং মুসলমান আলেমদের কথা প্রমাণিত রয়েছে।[৪২]

৪১. দ্রঃ *হাফেয আল-হাকামী, মা'আরিজুল কুবূল (দার ইবনুল জাওযী, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৬হিঃ), ২/৭৩৫-৭৪০; আব্দুর রাযযাক আল-বদর, যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুক্বছানিহি (দার কুনূয ইশবীলিয়া, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৭ হিঃ), পৃঃ ৩৭-৪০।*

৪২. *আশ-শারী'আহ, পৃঃ ১১৯, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ হামেদ ফেকী; লালকাঈ, শারহু ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ২/৯১১, তাহক্বীক্ব : ড. আহমাদ বিন সাঈদ গামিদী, ৮ম সংস্করণ, ১৪২৪ হিঃ।*

মোদ্দাকথা আল্লাহ্র প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব সমূহের প্রতি, নবী-রাসূলদের প্রতি, পরকালের প্রতি, তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের দৃষ্টিতে ঈমান :

খারেজীগণ তিনটি বিষয়কেই (অর্থাৎ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন) ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। সেকারণে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের মতে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মুরজিয়াদের বারোটি উপদলের মধ্যে কাররামিয়াগণ বিশ্বাস ও আমল ছাড়াই কেবল মুখের 'স্বীকৃতি' ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। সাধারণ মুরজিয়াগণ 'বিশ্বাস ও স্বীকৃতি'কে ঈমান বলে থাকেন।[৪৩] ইমাম আবু হানীফা ও কিছু সংখ্যক ফক্বীহ 'আমল'কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি; বরং 'ঈমানের বাস্তব পদ্ধতি' (شرائع الإيمان) বলে মনে করেন।[৪৪]

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি :

কুরআন-হাদীছের বিভিন্ন দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ঈমান বাড়ে ও কমে।

কুরআন থেকে দলীল :

(১) মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-

'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর। এতে তাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি হয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক' *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'নিশ্চয় মুমিনরা এরূপ যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াত সমূহ তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে' *(আনফাল ৮/২)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ-

৪৩. *ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯।*

৪৪. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৯৭।*

‘আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অনন্তর যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করেছে’ *(তাওবা ৯/১২৪)*।

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটিই সর্বাধিক বড় দলীল যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। আর এটিই হচ্ছে অধিকাংশ উত্তরসূরী ও পূর্বসূরী বিদ্বান এবং ওলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে কেরামর মত।[৪৫]

(২) হেদায়াত বৃদ্ধি : হিদায়াত হচ্ছে ঈমান। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدًّا–

‘আর যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ’ *(মারিয়াম ১৯/৭৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ‘যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাক্বওয়া দান করেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৭)*। আহলে কাহ্ফ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ‘তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম’ *(কাহফ ১৮/১৩)*। এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান বাড়ে ও কমে।[৪৬]

(৩) বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি : আল্লাহ তা‘আলা বিনয়-নম্রতা বৃদ্ধির সংবাদ দিয়েছেন। আর এটি ঈমান। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ‘আর তারা (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/১০৯)*। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিনয়-নম্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। আর বিনয়-নম্রতা বৃদ্ধি হয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ঈমান বৃদ্ধি হয়। কেননা বিনয়-নম্রতা ঈমান। মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ– ‘অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়-নম্র’ *(মুমিনূন ২৩/১-২)*।

মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ‘মুমিন লোকদের জন্য এখনও সময় আসেনি যে, আল্লাহ্র স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় বিনীত হবে’ *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

বনী ইসরাঈলের ১০৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর আত-ত্বাবারী বলেন, কুরআনের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষা, ওয়ায-নছীহত, উপদেশ বর্ণনা করা হয়েছে সে সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে মুমিন-মুসলমানদের (ঈমান) ও বিনয়-নম্রতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ পালন ও তাঁর আনুগত্যে তারা বিনয়ী হয়। কেননা তারা তাতেই শান্তি লাভ করে থাকে।[৪৭] অন্তরের আমল হ’ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা, আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করা, তাঁর উপর আশা-ভরসা করা, তাঁর জন্যই বিনয়ী ও নম্র হওয়া। অনুরূপ সকল কিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যা কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয়। আর এটাই এক মানুষ থেকে অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।[৪৮]

(৪) এক মুমিন অপর মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً–

‘মুমিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ-কষ্ট ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। মহান আল্লাহ জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীগণকে উপবিষ্টগণের উপর মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। আর উপবিষ্টগণের উপর জিহাদকারীগণের মহা প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন *(নিসা ৪/৯৫)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

لَا يَسْتَوِيْ مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنفَقُوْا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ–

‘তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা উভয়ে কখনই) সমান

৪৫. *তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হিঃ), ৪/২৫৪।*
৪৬. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৫/১৪৬।*
৪৭. *ইবনে জারীর, তাফসীর আত-ত্বাবারী, ৯/১৮১।*
৪৮. *কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ১৮৩।*

নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে মহান আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত' *(হাদীদ ৫৭/১০)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 'আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁরা বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন' *(নামল ২৭/১৫)*। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

'আর যেসব মুহাজির ও আনছার (ঈমানের দিক দিয়ে) অগ্রবর্তী ও প্রথম, আর যেসব লোক একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্যে এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সুতরাং এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য' *(তওবা ৯/১০০)*।

বর্ণিত আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হ'ল যে, ঈমান কমে ও বাড়ে। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, এক মুমিন অপর মুমিন থেকে ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। এজন্যই শক্তিশালী ঈমানদার আল্লাহ্র নিকট দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে অধিক প্রিয়।[৪৯]

(৫) জান্নাতে মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি : যার যত বেশী সৎ আমল রয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের দিক থেকে তত বেশী শক্তিশালী এবং এর ফলশ্রুতিতে জান্নাতেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 'তারাই সত্যিকারের ঈমানদার। এদের জন্যেই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চমর্যাদা। আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা' *(আনফাল ৮/৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً 'লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

(৬) পূর্ণাঙ্গ দ্বীন : পূর্ণাঙ্গ দ্বীন থেকে কিছু ছেড়ে দেওয়া হ'লে সেটা অপূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً-

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। ইমাম বুখারী বলেন, পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেয়া হ'লে তা অপূর্ণ হয়।[৫০]

অতএব আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে ঈমান ওয়াজিব করেছেন তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়, যেমনভাবে পবিত্র কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর দ্বীন এভাবেই ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।[৫১] অতএব ঈমান বাড়ে এবং কমে এবং মুমিন ব্যক্তিরাও ঈমানের দিক দিয়ে সবাই সমান নয়; বরং তাদের মধ্যে মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে।

(৭) অন্তরের প্রশান্তি : মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ-

'আর যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রভু! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? তিনি (ইবরাহীম) বললেন, হ্যাঁ; তবে এটা কেবল আমার আত্মিক প্রশান্তির জন্য' *(বাক্বারাহ ২/২৬০)*। আয়াতটি থেকে বুঝা যায় ঈমান বৃদ্ধি হয়।[৫২]

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সৎ আমল করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী তা সম্পন্ন করে থাকে, সে তার অন্তরে অবশ্যই প্রশান্তি লাভ করবে। আর এটাই হচ্ছে বাস্তবে আল্লাহ্র ওয়াদা। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহকে বেশী বেশী ডাকে, সৎ আমল বেশী বেশী করে তখন তার ঈমান বেড়ে যায়।

(৮) আল্লাহ্র প্রতি মুমিনদের ঈমান আনা : মহান আল্লাহ বলেন,

---

৪৯. *মুসলিম হা/২৬৬৪ 'ক্বদর' অধ্যায়।*

৫০. *বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৩।*

৫১. *ইবনে তাইমিয়া, শারহুল আক্বীদা ইছফাহানিয়্যাহ, পৃঃ ১৩৯।*

৫২. *ইবনু বাত্তা, আল-ইবানাহ, ২/৮৩৩।*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ করেছিলেন' *(নিসা ৪/১৩৬)*।

তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*।

মুমিন ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার পর যখন তাঁর আনুগত্য করে, বেশী বেশী সৎ আমল করে তখন তার ঈমান বাড়ে। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরো দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, পরকালের প্রতি ঈমান আনে। অতএব যে যত বেশী আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎ আমল করে, তার ঈমান তত বাড়তে থাকে।[৫৩]

(৯) মুমিনদের স্তর : মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় ঈমান বাড়ে এবং কমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ–

'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুলুম করেছে, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রসর হয়েছে। এটাই (মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) মহা অনুগ্রহ' *(ফাতির ৩৫/৩২)*।

এখানে মহান আল্লাহ ঈমানের দিক দিয়ে মুমিন বান্দাদের তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে যারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়, তারা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ সমূহ সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করে এবং হারাম বিষয় সমূহ ও অপসন্দীয় বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকে, তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত। যারা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী, তারা তাদের উপর অর্পিত ওয়াজিব বিষয় সমূহ সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করে থাকে এবং হারামকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকে। আর যারা নিজের আত্মার প্রতি যুলুম করেছে, তারা কিছু হারাম কাজে পতিত হয় এবং কিছু ওয়াজিব বিষয় সমূহ আদায়ে ত্রুটি করে। কিন্তু তাদের সাথে প্রকৃত ঈমান আছে। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রমাণ।[৫৪]

৫৩. ঐ ২/৮৩৪।
৫৪. আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী, তানবীহাত লত্বীফাহ, পৃঃ ৫০; তাফসীর আস-সা'দী, পৃঃ ৬৮৯; ইবনে কাছীর ৬/৫৬৮।

(১০) পাপের কারণে মানুষের অন্তর থেকে ঈমান আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকে। এমনকি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'না এটা কখনও নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরের উপর মরিচারূপে জমে গেছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অবশ্যই কোন মুমিন ব্যক্তি যখন পাপ কাজে পতিত হয় তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে পাপ থেকে তওবা-ইস্তেগফার করলে অন্তর থেকে দাগটি উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তার অন্তর মসৃণ উজ্জ্বল হয়ে যায়। কালো দাগ বাড়তে থাকলে (পাপ বাড়লে) তার সম্পূর্ণ অন্তর ঘিরে ফেলে। এ মরীচিকা সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, 'না এটা কখনও নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচারূপে জমে গেছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)*।[৫৫]

উপরে বর্ণিত আয়াত এবং হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান কমে ও বাড়ে।[৫৬]

[চলবে]

৫৫. তিরমিযী ৫/৪৩৪; ইবনে মাজাহ হা/৪২৪৪; আহমাদ ২/২৯৭, সনদ ছহীহ।
৫৬. যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুক্বছানিহি, পৃঃ ৫৪-৮০।

Contents

ইসলামী গান ও কবিতায় ভ্রান্ত আক্বীদা

*মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ**

সূচনা :

কুরআন মাজীদের আয়াত ও হাদীছে নববী দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের ইবাদত ও সৎ আমল কবুল হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে ঈমান-আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া। আর তা হচ্ছে শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক আক্বীদা হওয়া। নানা কারণে অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে আক্বীদা ও আমলে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু হওয়া সত্ত্বেও আক্বীদা নির্ভুল না হওয়ার কারণে পরকালীন জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছেন। তাই আমল করার পূর্বে সঠিক আক্বীদা পোষণ করা ও তা ব্যাপকভাবে চর্চা করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দেশে প্রচলিত কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা :

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের প্রধান বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল মহানবী শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা ও বিশ্বাস। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বিশ্বাসের মূল কারণগুলি নিম্নরূপ :

১. দেশের ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সঠিক আকাইদ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা।

২. তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সঠিক আক্বীদা গ্রহণ না করে মাযহাবের দোহাই দিয়ে তার অপব্যাখ্যা করা।

৩. আলেম ও বক্তাদের মুখে শোনা কথা বাছ-বিচার না করে গ্রহণ করা ও তা প্রচার করা।

৪. দলীল-প্রমাণ ছাড়া আলেমগণ ধর্মীয় বই-পুস্তকে জাল-যঈফ বর্ণনা ও ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা লিখে থাকেন। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কবি-সাহিত্যিকগণ আলেম লেখকদের পদাংক অনুসরণ করে নিজ রচিত কবিতা, ইসলামী গান ও গযল, প্রবন্ধ এবং সিরাতুন্নবী গ্রন্থে সেসব ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার করেন।

প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কাব্য সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা ও ঐতিহ্য সৃষ্টিতে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণের অসামান্য অবদান রয়েছে। বলতে গেলে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রশংসামূলক নানা কথা নিয়ে। বিশেষ করে পুঁথি-সাহিত্যের মাধ্যমে না'ত বা রাসূল প্রশস্তি ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়। ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে মুসলিম কবিগণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, সেই শুরুকাল থেকেই কবিগণ কাব্য রচনার সূচনাতেই রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশস্তি গাইতে গিয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে অথবা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অতিমাত্রায় ভক্তিভরে 'অতিমানব' অথবা আল্লাহ্র 'সমকক্ষ' জ্ঞান করেছেন। বিশেষত বাংলা কবিতা ও কাব্য সাহিত্যে 'নূরনবী' প্রসঙ্গটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের সূচনা করেছেন এভাবে-

'পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার।
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই যে জাতির মূলে ভূবন নিরমিলা।
তাহার পিরিতে প্রভু সৃজিল সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার।[৫৭]

এখানে কবি আল্লাহকে নিরাকার সত্তা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অথচ সঠিক আক্বীদা হল আল্লাহ্র আকার আছে। তিনি নিরাকার নন। তবে তাঁর সাথে অন্য কিছুর সাদৃশ্য নেই *(শূরা ৪২/১১)*।

কবি মুহাম্মাদ খান 'মকতুল হুসেইন' কাব্যের শুরুতে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রশস্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

মুহাম্মাদ নবী নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া
পাপীগণ পরিণামে যাইবে তরিয়া।
দয়ার আঁধার নবী কৃপার সাগর
বাখান করিতে তার সাধ্য আছে কার।
যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপে নিরঞ্জন
সৃষ্টি স্থিতি করিলেক এ চৌদ্দ ভূবন।[৫৮]

অষ্টাদশ শতকের কবি সৈয়দ হামজা পুঁথিকাব্যে রাসূল প্রশস্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

মোহাম্মদ নামে নবী সৃজন করিয়া
আপনার নূরে তাঁকে রাখিলা ছাপাইয়া।[৫৯]

আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'নূরনবী' প্রসঙ্গ :

মুসলিম জাগরণ ও ইসলামী চেতনা সৃষ্টির দিশারী রূপে আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), জাতীয় কবি কাযী নজরুল ইসলাম এবং কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের বিচিত্র রূপ তাঁরা ইসলামী গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে সুনিপুণভাবে দক্ষ শিল্পীর মত চিত্রিত করেছেন। তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও প্রচলিত ভুল কথার অন্ধানুসরণ করে তাঁরাও ভুল আক্বীদা কাব্যাকারে লিখে গেছেন। এখানে কয়েকজন প্রথিতযশা কবির লিখিত কবিতার কিছু চরণ উল্লেখ করছি।

* *সহকারী অধ্যাপক, ফজিলা রহমান মহিলা কলেজ, কৌরিখাড়া, পিরোজপুর।*

৫৭. মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন, সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলিম প্রতিভা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৪), পৃঃ ১৭।
৫৮. ঐ, পৃঃ ১৮।
৫৯. তদেব।

Contents

কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) :

কবি গোলাম মোস্তফা মুসলিম নবজাগরণের কবি। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও চিন্তাধারায় ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং মুসলিম ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালবাসা থেকেই তিনি 'বিশ্বনবী' রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'নূরের তৈরী নবী' রূপে আখ্যায়িত করে মিথ্যা কথা প্রচারে ভূমিকা রেখেছেন এবং বিশ্বনবীর সুমহান মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছেন।

তাছাড়া তার রচিত না'তে রাসূল-

নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মুহাম্মাদ রাসূল,
আমার ....।
নূরের রবি যে আমার নবী
পূর্ণ করুণা ও প্রেমের ছবি
আমার ...।[৬০]

তারপর আরো অগ্রসর হয়ে কবি গীত রচনা করলেন এভাবে-

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি।
ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়া তুল্লা আলাইকা।
চাঁদ সুরুয আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে
ইয়া নবী সালাম আলাইকা
.....।

রাসূলকে 'নূরনবী' আখ্যায়িত করে ভ্রান্ত আক্বীদাপূর্ণ উপরোক্ত গীত কবিতাটি গীতিকার কবি গোলাম মোস্তফা ও বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ-এর দ্বৈত কণ্ঠে কলিকাতায় তৎকালীন গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড হয়।[৬১] তৎপর তা 'বাংলা মীলাদ' নাম ধারণ করে বাংলা মুলুকে 'মৌলুদ' অনুষ্ঠানে 'কিয়াম' কালে বাংলা 'দরূদ ও সালাম' রূপে পাঠ করার কিংবদন্তীর মর্যাদা (?) অর্জন করেছে। আজও বাংলা অঞ্চলের সর্বত্র সমানভাবে নবীর উপর সালাম পৌঁছানোর নামে বাংলা কবিতার সুর মূর্ছনা মীলাদ প্রেমিকদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে। ভাবতে অবাক লাগে, একজন বাঙালী কবি রচিত গীত কবিতা দরূদ ও সালাম রূপে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ ও উপকরণে পরিণত হ'তে পারে কিভাবে? এ দেশের আলেমগণ কিভাবে দ্বীন ইসলামের এই বিকৃতি চোখ বুঁজে মেনে নিয়েছেন, সেটাই প্রশ্ন।

৬০. ঐ, পৃঃ ৩৪।
৬১. ঐ, পৃঃ ৩৫।

কাযী নজরুল ইসলাম (মৃঃ বাংলা ১৩০৬/১৯৭৮ইং) :

জাতীয় কবি কাযী নজরুল ইসলাম আমাদের গর্ব। তাঁর কবিতা, ইসলামী গান ও গযল এবং না'তে রাসূল পাঠে আমরা মুগ্ধ ও বিমোহিত হই। নব জাগরণে অনুপ্রাণিত হই। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি বাংলা কাব্য সাহিত্যের বিশাল আঙিনায় তাঁর রচিত ইসলামী কবিতা ও না'তে রাসূল নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও কবির অনেক না'তে রাসূল ও ইসলামী গান ভুল আক্বীদায় কলুষিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি না'তে রাসূলের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল-

১. মুহাম্মাদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে
ঐ নামে এত মধু থাকে কে জানিত আগে
মুহাম্মাদ নাম যতই জপি.....।

২. আমার মুহাম্মাদ নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়।

৩. নাম মুহাম্মাদ বোলরে মন, নাম আহমদ বোল।

৪. মুহাম্মাদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কিরে তোর কণ্ঠেরি গান এতই মধুর লাগে।

৫. মুহাম্মাদ মোর নয়নমণি মুহাম্মাদ নাম জপমালা
মুহাম্মাদ নাম শিরে ধরি, মুহাম্মাদ নাম গলে পরি।[৬২]

ফররুখ আহমাদ (১৯১৮-১৯৭৪) :

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাব্যধারায় ইসলামের গৌরব মহিমা পুনরুদ্ধার ও মুসলিম পুনর্জাগরণের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ। তাঁকে বলা হয় 'মুসলিম রেঁনেসার কবি'। সকল জড়তা পায়ে দলে জেগে উঠার হাতছানি রয়েছে তাঁর কাব্য ও কবিতায়। এতদসত্ত্বেও সমাজের চলমান ধ্যান-ধারণা দ্বারা কবি কিছুটা বিচ্যুৎ-বিভ্রান্ত হয়েছেন। যেমন একটি না'তে রাসূল লিখতে গিয়ে কথিত 'নূরনবী' নামে ভ্রান্ত আক্বীদা তিনিও প্রকাশ করেছেন এভাবে-

ওগো নূরনবী হযরত
আমরা তোমারি উম্মত।
তুমি দয়াল নবী,
তুমি নূরের রবি,
তুমি বাসলে ভাল জগত জনে
দেখিয়ে দিলে পথ।
আমরা তোমার পথে চলি
আমরা তোমার কথা বলি
তোমার আলোয় পাই যে খুঁজে
ঈমান, ইজ্জত।
সারা জাহানবাসী
আমরা তোমায় ভালবাসি,
তোমায় ভালবেসে মনে
পাই মোরা হিম্মত।[৬৩]

৬২. ঐ, পৃঃ ২০।
৬৩. বাংলা সহজপাঠ, পঞ্চম শ্রেণী, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর, ২০১২, পৃঃ ৯৬-৯৭; ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ৪র্থ শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড,ঢাকা।

বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে সরকারীভাবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিশু-কিশোরদের জন্য পাঠ্যপুস্তকে মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে মারাত্মক এক মিথ্যা আক্বীদা পরিবেশন করা খুবই পরিতাপের বিষয়। মানব জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। আজকের শিশু-কিশোরগণ আগামী দিনে মুসলিম সমাজের কাণ্ডারী। শিশু-কিশোরদের মন কাদামাটির মত কোমল। এ সময় তাদেরকে যেমন খুশি তেমন করে গড়ে তোলা যায়। এ সময়ের শিক্ষা পাথরে খোদিত নকশার ন্যায়। তাই শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে কোমলমতি কিশোর মনের গহীন কোণে আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস শিখিয়ে 'বিষ বৃক্ষের' উপর তাদের অনাগত ভবিষ্যত জীবনের ভিত রচনা করা হচ্ছে। সরকার ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের প্রতি আবেদন, ভবিষ্যতে কোন কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ্যপুস্তকের জন্য নির্বাচন করার প্রাক্কালে ভুল-শুদ্ধ যাচাই-বাছাই করবেন।

বিল্লালের গযল, চরমোনাইয়ের গযল, আমার প্রিয় ইসলামী গান, শাহী গযল প্রভৃতি নামকরণে বাজারে প্রচুর ইসলামী গযলের বই-পুস্তক পাওয়া যায়। এ সকল বই-পুস্তকে হাম্দ ও না'তের নামে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে নানা প্রকার ভ্রান্ত ও শিরক মিশানো আক্বীদা বিস্তার লাভ করছে। স্কুল ও মাদরাসার কচিকাঁচা বালক-বালিকারা সেইসব বই থেকে গযল মুখস্থ করে মীলাদুন্নবী-সীরাতুন্নবী অনুষ্ঠানে, ওয়ায-মাহফিলে গাইতে থাকে। ওয়ায়েযীন ও বক্তাগণ ইসলামী জালসায় সুর করে গযল গেয়ে থাকেন। বিশেষ বিশেষ দিবসে রেডিও এবং টেলিভিশনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে নামজাদা কণ্ঠ শিল্পীগণ ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পথে-প্রান্তরে, ফসলের মাঠে কৃষক-শ্রমিক কাজ করতে করতে ইসলামী গান গায়। নদীর বুকে নৌকার মাঝিরা এসব গান গায়। কবি-সাহিত্যিকরা কেউ বুঝে কেউ না বুঝে সেগুলো লিখেছেন। মানুষ তা কণ্ঠে তুলে নিয়ে দিবা-রাত্রি গাইছে। কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে। সকলেই নিজেকে তাওহীদী আক্বীদায় বিশ্বাসী খাঁটি মুসলিম বলে ধারণা করে। যদিও তার কণ্ঠে গাওয়া সঙ্গীতটি তাকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কিত ভ্রান্ত আক্বীদার বিষমিশ্রিত কয়েকটি ইসলামী সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন সেই তো দোজাহানের ধনী।
নবী মোর নূরে খোদা তার তরে সকল পয়দা
আদমের কলবেতে তারই নূরের রওশনী...
নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি।[৬৪]

প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলীমের কণ্ঠে এই সঙ্গীতটি সরকারী প্রচার মাধ্যমে সর্বদাই প্রচারিত হয়। গণমানুষের নিকট সঙ্গীতখানি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু এর ভিতর এমন সব বিষয় রয়েছে, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে শিরকে আকবর (বড় শিরক) হয় এবং মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

২. সব মানুষের সেরা মানুষ নবীজি আমার
নূরের বাতি দাও জ্বেলে দাও নয়নে আমার।
তোমার দয়ার কাঙাল আমি
কাঁদি সারা দিবস যামী।
দূর কর দূর কর মনে মিটাও আঁধিয়ার।[৬৫]

৩. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ রাসুল
......
নূরের নবী প্রেমের ছবি নাইকো তাহার তুল,
ও ভাই নাইকো তাহার তুল
লা ইলাহা..... ।[৬৬]

৪. দূর আরবে ফুটেছিল একটি নূরের ফুল (২ বার)
সে ফুল আমার কমলীওয়ালা রাসূলে মাকবুল
......
নূর নবীজীর দরূদ তাকে করে যে আকুল...
রাসূলে মাকবুল, আমার রাসূলে মাকবুল।[৬৭]

৫. দিবা নিশি জপি আমি আল্লাহ নবীর নাম
ঐ নামের গুণে পুরবে জানি (২ বার) আমার মনস্কাম
আল্লাহ নবীর নাম
......
ঐ নামে যে পরবে মালা, জীবন হবে তার উজালা
.... আল্লা নবীর নাম।[৬৮]

৬. ডেকে লও রাসূলুল্লাহ, রওজা পাকের কিনারে
আমি সহিতে পারি না বিরহ জ্বালা, ধন্য কর দীদারে
আমি কেঁদে কেঁদে হইগো সারা, ধন্য কর দীদারে।
আজো রওজায় শুয়ে থেকে হায়,
কাঁদেন তিনি উম্মাতের মায়ায়।[৬৯]

৭. নূরুন আলা নূর মুহাম্মাদ নূরের খাজিনা
তোমার নূরের বদন দেখতে আমি দেওয়ানা।
তোমার নূরে জগৎ জাহান সৃজিয়াছেন আল্লাহ মহান
....
তোমার নূরের লোভে লোভী তামাম দুনিয়া।
তোমার নূরে পয়দা হয়ে ফেরেশতাদের সিজদা লয়ে
পাইল তাজীম আদম নবী তারই উছিলায়
তোমার নূরের তাজাল্লীর ঐ ইশকে দেওয়ানা।[৭০]

-মাওলানা আ.জ.ম. অহিদুল আলম।

৬৪. ডাঃ এম.এ. সামাদ, আমার প্রিয় ইসলামী গান, পৃঃ ৭৮, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৫। প্রকাশক : সাহিত্য সোপান, বগুড়া।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।
৬৯. শাহী গযল বা হিযবুল্লাহ জাগরণী, পৃঃ ১৭; ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৮. মরণকালে দিও গো দেখা হে প্রিয় রাসূল আমায়
হৃদয় মাঝে তোমারি নাম জপি সারাক্ষণ।[৭১]

৯. নবী রাসূলকে মুর্দা বলে কোন সে অবুঝ দল
......
নবী রাসূলগণ কবর শরীফে জিন্দা আছেন হায়
মূসা নবীকে একদা রাসূল নামাজ হালে পায়।
মোদের নবী হায়াতুন্নবী আছেন জিন্দা হালে
মোদের লাগি দোয়ায় রত আছেন সাঁঝ সকালে।
উম্মতেরা করছে কি কাজ নবী দেখতে পায়
সেই নবীকে মুর্দা বলা কাদের শোভা পায়।
......
মাযহাব মানা ফরজ বলে সঠিক আলেমেরা
মাযহাব যারা ছাড়িবে তারা হবে যে গোমরা
কোন বাতিল দল মাযহাব মানে না মোদের জামানায়
সত্য আলোর রশ্নি ছেড়ে আঁধারে কাতরায়।[৭২]

.... মাঃ হায়দার হুসাইন

১০. ও গো নবী সরোয়ার তুমি হাবীব আল্লার
....
সৃষ্টি করে নূরকে তোমার অতি তাজীমে
সবার আগে রাখেন খোদা আরশে আজীমে
সে পাক নূরেতে তোমার
গড়েন তামাম সংসার
সৃষ্টি হল আরশ, কুরসি, জমিন ও আসমান।
.....
পেলে দিদার প্রভুর
নূরে মিলে গেল নূর।[৭৩]

-মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান।

১১. সব নবীদের সেরা তুমি আখেরী রাসূল,
....
পয়দা হল নিখিল জাহান তোমারি পাক নূরে
ধরা হতে আঁধার কালো পালিয়ে গেল দূরে।[৭৪]

- মাওলানা আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ

১২. নূর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু সব নবীর সুলতান
তুমি লাহুতের মেহমান,
....
চাঁদ-সুরুজে তোমার দ্যুতি
গ্রহ তারায় তোমার জ্যোতি
আরশ ফালাক সকল তোমার
নূরেতে রৌশন।[৭৫]

-মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান।

জনৈক কবি লিখেছেন,

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা
আহমদ আহাদ বিচার হলে যায় জানা
আহমদ নামেতে দেখি
মিম হরফে লেখেন নবী
মিম গেলে আহাদ বাকী
আহমদ নাম থাকে না।

আরেকজন কবি লিখেছেন,

আহমদের ঐ 'মিম'-এর পর্দা
উঠিয়ে দেখরে মন
দেখবি সেথা বিরাজ করে
আহাদ নিরঞ্জন।[৭৬]

একজন মুসলিম গীতিকারের রচিত কথিত ভক্তিমূলক গান দেশের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পীরা সরকারী প্রচার মাধ্যমে সর্বদাই গেয়ে থাকেন। যার কথাগুলি খুবই আপত্তিজনক। কথাগুলি হ'ল-

ছায়া বাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ
তুমি হাকিম হইয়া হুকুম কর,
পুলিশ হইয়া ধর
সর্প হইয়া দংশন কর
ওঝা হইয়া ঝাড়।
তুমি মার তুমি বাঁচাও
তুমি খাওয়াইলে আমি খাই, আল্লাহ...
এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া
এত যত্নে গড়াইলেন সাঁই
এই যে দুনিয়া...... ।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত শ্রীমৎ শংকরাচার্য্য অদ্বৈতবাদ মতবাদ প্রচার করেছেন। যার সারকথা হ'ল সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি অভিন্ন বস্তু। জগতে যা কিছু বিদ্যমান তার সবকিছুই স্রষ্টার অংশ বিশেষ। যার আরেক নাম সর্বেশ্বরবাদ। যার অর্থ সব জড় ও জীব জগতের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। এই বিশ্বাস থেকেই হিন্দুরা সকল সৃষ্ট বস্তুর পূজা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করার দাবী করে।

খৃষ্টানরা দাবী করে যে, ঈশ্বর সর্বপ্রথম তার নিজের 'যাত' বা সত্তা থেকে 'কালেমা' বা পুত্র যীশু খৃষ্টকে সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে সকল সৃষ্টিকে তিনি সৃষ্টি করেন। খৃষ্ট ধর্মের 'সৃষ্টিতত্ত্বের' আদলে সপ্তম হিজরী শতকের ছূফী মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (৫৬০-৬৩৮ হিঃ) বলেন, 'আল্লাহ সর্বপ্রথম 'নূরে মুহাম্মাদী' সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে সকল সৃষ্টি জগতকে পয়দা করেন। জাবির (রাঃ)-এর নাম জড়িয়ে- 'সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তার নূর থেকে সৃষ্টি করেন'- এই মিথ্যা কথাটি সর্বপ্রথম ইবনুল আরাবী তার রচিত বই-পুস্তকে 'হাদীছ' নাম দিয়ে উল্লেখ করেন।[৭৭]

---

৭১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২।
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।
৭৬. মোঃ আবু তাহের বর্ধমানী, অধঃপতনের অতল তলে, পৃঃ ৬৪।
৭৭. ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃঃ ২৫৯ তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৮।

আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, হিন্দু ধর্মের 'অদ্বৈতবাদ', খৃষ্টান ধর্মের 'বহু ঈশ্বরবাদ' এবং ইবনুল আরাবী উদ্ভাবিত মুসলমানদের 'নূরে মুহাম্মাদী তত্ত্ব'-এর মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। বরং চমৎকার মিল রয়েছে। তিন ধর্মের তিনটি মতবাদের মৌলিক কথা একটিই। আর তা হচ্ছে জগতের সকল সৃষ্টিই হিন্দুর 'ঈশ্বর', খৃষ্টানের 'খোদা' এবং মুসলমানের 'আল্লাহ্‌র' সত্তা থেকে সৃজিত হয়েছে।

'আল্লাহ্‌র নূরে নবী পয়দা, নবীর নূরে জগত পয়দা' যার সংক্ষিপ্ত রূপ 'নূরনবী', এই বচন যারা হাদীছ নামে প্রচার করেন এবং এ আক্বীদা পোষণ করেন তাদের কথার অর্থ দাঁড়ায় যে, 'আল্লাহ্‌র সত্তা' বা 'যাত' একটি 'নূর' বা নূরানী বস্তু এবং আল্লাহ স্বয়ং নিজের সেই যাতের বা 'সত্তার' অংশ থেকে তাঁর নবীকে পয়দা করেছেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অথচ আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে যে, কোন হাদীছ গ্রন্থেই ছহীহ, যঈফ, হাসান কোন সূত্রেই রাসূল (ছাঃ) থেকে তিনি 'নূর নবী' বা 'নূর দ্বারা তৈরী' এমন একটি হাদীছও বর্ণিত হয়নি। হিজরী সাতশত শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, সালাফে ছালেহীন, চার ইমাম সহ কোন মুসলিম আলেম 'নূরনবী' সংক্রান্ত কিছুই জানতেন না। যদি তাঁরা জানতেন তাহ'লে অবশ্যই ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করে যেতেন। কিন্তু তা নেই। এমনকি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পাঁচশত বছরে কোন দল-উপদল বা বাতিল ফের্কার পক্ষ হ'তেও 'নূর নবী' বিষয়ক কিছু আলোচিত হয়নি।

কিন্তু বিচিত্র এই দেশ। বিচিত্র এ দেশের মানুষ। কবির ভাষায়- এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি...। সব সম্ভবের এই দেশে কে শোনে কার কথা। প্রমাণবিহীন বাংলা বই-পুস্তক আর ওয়ায-মাহফিলে বক্তাদের মুখে শোনা কথার উপর নির্ভরশীল হয়ে কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, গীতিকার সকলেই বিভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাস স্থাপন করে বা না করে অভ্যাসগত শিরকের পঙ্কিলে আটকে গেছে। যার শেষ পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ আল্লাহ শিরকের ফলাফল সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যদি তারা শিরক করে তাহ'লে তাদের আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৮৮)*।

সঠিক আক্বীদা :

ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ), খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) ও আরবের মুশরিকরা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে অতি ভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে শিরকে নিপতিত হয়েছিল। এজন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীছে আবদিয়াত (বান্দা), বাশারিয়াত (মানবত্ব), গায়েবি খবর সম্পর্কে না জানা প্রভৃতি বিষয়ে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। যাতে ঈমানদারগণ রাসূলের আনুগত্য ও ভালবাসার পাশাপাশি তাঁর প্রতি অতি ভক্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত রাসূলের পরিচিতি বর্ণনা করে বলেন, 'বল, আমি তোমাদের মতই মানুষ; আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ' *(হামীম সাজদা ৪১/৬)*।

রাসূল (ছাঃ) নিজেই নিজের বৈশিষ্ট্য পেশ করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমনভাবে তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৭৮] সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সকল ফেরেশতা নূর থেকে এবং জিন্ন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে (মানব জাতি) সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সব ছিফাত দ্বারা, যে ছিফাতে তোমাদের ভূষিত করা হয়েছে (অর্থাৎ মানব জাতিকে মাটি ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে)।[৭৯] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র ফেরেশতাগণ 'নূর'-এর তৈরী। মানব জাতি কিংবা তার মধ্য হ'তে নবী-রাসূলগণ নূরের তৈরী নয়।

আলেমগণের উচিত, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও ছহীহ হাদীছগুলির উপর নির্ভর করা এবং সেই মুতাবিক সঠিক ও বিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণ ও প্রচার করা। সঠিক আক্বীদা গ্রহণের কথা বলা হ'লে যদি আপনি বলেন, 'এগুলি ওহাবীদের কথা। ওহাবীদের নিকট থেকে আক্বীদা শিখতে হবে না। এদেশে ইসলাম প্রচার করেছে ওলী-আউলিয়াগণ। এতদিন পর ওহাবীরা এসেছে নতুন করে আক্বীদা শিখাতে'? এসব উক্তি করে আপনি নিজেকে দলীয় সংকীর্ণতার কুটিল পঙ্কিলে নিমজ্জিত করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ 'ওহাবী' অথবা 'সুন্নী' এ রকম বিভাজন করে বর্ণিত হয়নি। এক্ষেত্রে আপনি ঈমানদার কি-না সেটাই বিবেচ্য বিষয়। বিদ'আতী ও কুফরী আক্বীদা-আমল সমর্থন করা হ'লে তিনি পাক্কা 'সুন্নী'। আর তার বিরোধিতা করলে কা'বা মসজিদের ইমাম ছাহেব হ'লেও তিনি ওহাবী। কি চমৎকার অভিধা! এসব গোঁড়ামি ছেড়ে পরকালীন নাজাতের লক্ষ্যে সকলকে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করতে হবে। ভ্রান্ত আক্বীদা ও শয়তানী পথ ছাড়তে হবে। এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

উপসংহার :

বাংলা ভাষায় রচিত কাব্য ও কবিতায়, গযল ও গানে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা আবহমান কাল থেকে প্রচার হয়ে আসছে। প্রচলিত শত শত গযল ও ইসলামী সঙ্গীতের মধ্য থেকে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। সকল দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে অতীতের ভুল সংশোধন করে নেওয়া মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আসুন! সে লক্ষ্য সামনে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব পালন করি। নির্ভুল আক্বীদা প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহযোগিতা দান করি। আল্লাহ তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৭৮. ছহীহ বুখারী হা/৪০১।
৭৯. মুসলিম; মিশকাত হা/৫৭০১।

Contents

সফল মাতা-পিতার জন্য যা করণীয়

সংকলনে: আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

সন্তান জন্ম দেয়া সহজ। কিন্তু সফল ও যোগ্য পিতা-মাতা হওয়া কঠিন। সন্তান মানুষ করা আরও কঠিন। পিতা-মাতার কাছে সন্তান অমূল্য সম্পদ। তাদের ঘিরেই থাকে সব স্বপ্ন। অথচ সফল পিতা-মাতা কি করে হ'তে হয় অধিকাংশ মানুষই তা জানেন না বা জানলেও অনুসরণ করেন না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। সন্তানদের সাথে দূরত্ব বাড়ছে, সন্তানরা বিপথগামী হচ্ছে, মানসিক যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব বাড়ছে। পশু-পাখির বাচ্চা জন্ম নিয়েই দৌড়ায়। কিন্তু মানব সন্তানকে যে যত্ন ও নিয়ম করে হাঁটতে-দৌড়াতে শিখাতে হয়।

মনে রাখতে হবে শিশুরাই একটি দেশ, সমাজ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। তাই এরাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পাওয়ার দাবীদার। এই বয়সে তারা যা শিখে বা তাদের যা শেখানো হয়, তার ভিত্তির উপরই গড়ে ওঠে তাদের তথা জাতির ভবিষ্যত। অথচ শিশুরা আজ যে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা পাচ্ছে, তাতে তারা আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারছে না। প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা শুধু স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নয়নের বিষয়গুলোও এ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। আজকাল শিশুরা মারামারি, চুরি, ডাকাতি, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, সন্ত্রাস এমনকি হত্যাকাণ্ডসহ নানা অপরাধে জড়িত হচ্ছে। কোমলমতি শিশুদের নিষ্ঠুরতা ও সহিংস প্রবৃত্তি গ্রাস করছে কেন? সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে বিকশিত হওয়ার বদলে কেন তারা অমানুষে পরিণত হচ্ছে? এই প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজার দায় সমাজের সচেতন সবারই।

জন্মের পর থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। শিশুর শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় মায়ের কাছ থেকে তথা পরিবার থেকে। একটি শিশুকে গড়া মানে একটি জাতি গড়া। আর জাতি গড়ার এ মহান দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বাবা-মা ও পরিবারের উপর। এ কারণেই সন্তান লালনের আগে কিছু কিছু বিষয়ে বাবা-মায়ের প্রস্তুতি নেয়া অত্যাবশ্যক। অন্য কিছুতে গাফলতি করলেও এ বিষয়ে গাফলতি ঠিক নয়। কারণ এর সঙ্গে সমাজ ও জাতির ভবিষ্যত জড়িত। ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি চলে, তেমনি শিশুর চারিত্রিক উন্নয়ন সাধনে দৃঢ় প্রচেষ্টা দরকার। সোনার মানুষ গড়ার জন্যও প্রয়োজন কঠোর সাধনা।

আমরা শিশুর শারীরিক বিষয়ে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছি কিন্তু তার মানসিক বিকাশ, তার চিন্তা-চেতনা সঠিকভাবে গড়ে উঠছে কি-না সে বিষয়ে আমরা তেমনভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি না। ফলে অধিকাংশ শিশুরা ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা-চেতনায় এবং অভ্যাসে বড় হয়ে উঠে এবং বড় হয়ে ঐ সকল বদ অভ্যাস ও ত্রুটিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্যাগ করতে পারে না। যেমন দুই/তিন বছরের অনেক শিশুকে দেখা যাবে, জিনিসপত্র নষ্ট করছে, যা খাচ্ছে অর্ধেক ফেলে দিচ্ছে, টেবিলে-সোফায় লাফালাফি করে জিনিসপত্র ক্ষতি করছে। খেলনাপত্র ভাংচুর করছে। অন্য বাড়িতে গিয়ে সাজানো জিনিসপত্র নাড়াচাড়া বা নষ্ট করছে। জানালা দিয়ে বাইরে জিনিস ফেলছে। অথচ মমতাময়ী মাতা খুশী মনে বলছেন, আমার সন্তান দারুণ প্রাণচঞ্চল, দারুণ দুষ্ট। এসব কথা তারাই বলেন, যারা নিজেরা ঐভাবে বড় হয়েছেন এবং এ বিশৃঙ্খলভাবে বেড়ে উঠাকেই সঠিক মনে করছেন। অনেক মায়েরা এও বলে থাকেন, বাচ্চামানুষ করবেই তো, বড় হ'লে ঠিক হয়ে যাবে। অথচ এটা একেবারেই ভুল কথা। বড় হ'লে শিখবে না। বরং এসব বদ অভ্যাস, বিশৃঙ্খল কাজ ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে।

বাচ্চারা ৬ মাস থেকেই ভালমত শিখতে শুরু করে। আদর যেমন বোঝে, ধমকও বোঝে। ভালো কাজ, খারাপ কাজ শেখার বা বোঝার ক্ষমতা ঐ সময় থেকেই শুরু হয়ে যায়। যেমন দু'বছরের কোন শিশুকে দেখবেন চকলেটের কভার খুলে ঘরের কোণে রাখা ডাস্টবিনে গিয়ে ফেলছে। কোন নতুন বাসায় গিয়ে শোপিস দেখছে, কিন্তু ধরছে না। যাতে ভেঙ্গে না যায়। দু'বছরের বাচ্চারা নিয়ম-শৃঙ্খলা, সৌন্দর্যবোধ, গুছিয়ে রাখা, নষ্ট না করা, কোনটা করা উচিত এবং উচিত নয় তা বোঝার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। বরং আমরা অভিভাবকরা বুঝি না তাদের কিভাবে শেখানো উচিত। কারণ ঐ শিশুর ব্লাংক ব্রেন সফটওয়ারে সবকিছু বুঝতে চায়, জানতে চায় এবং সে তার ব্রেনে দ্রুত সবকিছু সংরক্ষণ করে রাখে। ছয় বছরের মধ্যে শিশুরা ব্রেনের পূর্ণতা পেয়ে যায়। ঐ বয়সে সে যা কিছু দেখে, শোনে, বোঝে পরবর্তী জীবনে তার প্রতিফলন ঘটে। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা অথবা উদারতা, মায়া-মমতা প্রভৃতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক গুণাবলিতে বিকশিত হয়। এসময় যা ইনপুট হবে পরবর্তী জীবনে তাই আউটপুট হবে। সুতরাং এই সময়টি শিশুদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সবচেয়ে আদরের সন্তানকে আদব-কায়দায়, সৃষ্টিশীলতায় এবং কিভাবে আদর্শ মানুষ করতে হয় এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে নিম্নে বিষয় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।-

শিশুকাল থেকে ইতিবাচক শিক্ষায় গড়ে তোলা :

একথা কখনই মনে করা ঠিক নয় যে, শিশু কিছু বোঝে না। ও ঠিকই বোঝে, ক্ষেত্র বিশেষে ও পিতা-মাতার চাইতে দ্রুত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। এখন সে কাদামাটির ন্যায়, যেভাবে গড়া হবে সেভাবেই গড়ে উঠবে। পিতা-মাতা, বাড়িতে থাকা ভাই-বোনরাই তার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক। শিশুরা দেখে শেখে, শুনে শেখে, করে শেখে। তাদের ব্রেনের সফটওয়ার এসময় সম্পূর্ণ খালি থাকে। ফলে যা দেখবে, শুনবে, অনুভব করবে, তাই ব্রেনে দ্রুত রেকর্ড হয়ে যাবে। যেমন কোন শিশু ঘরের ভেতর দৌড়াতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে গিয়ে আঘাত পেয়ে কাঁদতে শুরু করল, তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে আঘাত করে বাচ্চাকে বুঝানো হ'ল দরজাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। বাচ্চার কান্না থেমে গেল। এতে সন্তানকে শেখানো হ'ল যে বাঁধা দেয় বা কষ্ট দেয় তাকে ধরে মারতে হয়। ফলে

ঐ শিশু প্রতিশোধ পরায়ণতা শিখল শিশুবেলা থেকেই।

আরো একটি উদাহরণ, তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত সন্তানকে যে টিফিন দেয়া হয়, সেটা অধিকাংশ সময় সে নিজে খায় না, তার বন্ধুরা খেয়ে ফেলে। একদিন সন্তানকে বলা হ'ল যে, 'তোমার টিফিন তুমি খাও না, বন্ধুরা খায় কেন? তুমি বোকা, না গাধা? নিজের স্বার্থ বুঝ না? আজ থেকে তোমার টিফিন বন্ধুরা যেন না খায়'। এভাবে বলার মাধ্যমে সন্তানকে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা শিখানো হ'ল। ঐ সন্তান হয়ত পরবর্তীতে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখবে না। কারণ সে ছোট বেলা থেকেই স্বার্থপরতা শিখে এসেছে। সে শিখেছে, নিজেরটা আগে দেখো। অথচ এক্ষেত্রে শিখানো উচিত ছিল বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে খেয়ো, সে খেয়েছে কি-না? মিলে-মিশে খেয়ো। মানুষকে সাহায্য করো, দু'টি ভালো কলম থাকলে বন্ধুকে একটি দাও। যাতে ও ভালো লিখতে পারে।

এভাবে শিশুকে বড় মন নিয়ে বড় হ'তে দিতে হবে। তবেই বাবা-মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে। যত দেয়া যায়, বহুগুণে তা ফিরে আসে।

শিশুদের আত্মমর্যাদাবোধ সমুন্নত রেখে গড়ে তোলা :

অভিভাবকরা চান বাচ্চারা সম্মান ও মর্যাদাবোধ নিয়ে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠুক। কিন্তু তাদেরকে উপরে উঠাতে গিয়ে না বুঝে নীচে টেনে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের বড় করতে গিয়ে ছোট করা হচ্ছে। নিচের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে কিন্তু ভাবা হচ্ছে তারা উপরে উঠছে। যেমন কোন আত্মীয়ের সামনে নিজের সন্তানকে বলা হচ্ছে, 'তোমার খালাতো ভাই কত বুদ্ধিমান! কত সুন্দর করে কথা বলে! ব্যবহার কত ভালো, এদের দেখে শিখো। কিছুতো পারো না'। এতে সবার সামনে তার মর্যাদায় আঘাত দেয়া হ'ল। আরও বলা হ'ল, 'অমুক ছেলে পড়াশোনায়, খেলাধূলায় জিনিয়াস, তুমি কি করো! তুমি তো একটা গাধা! এতে কি ছেলেকে উৎসাহিত করা হ'ল না নিরুৎসাহিত করা হ'ল?

একটি দু'বছরের শিশুকে তাচ্ছিল্য করলেও সে মন খারাপ করে। সেখানে কিশোর বয়সী সন্তানকে সবার সামনে ছোট করে তাকে কিভাবে বড় করা যাবে? তার আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হ'তে হ'তে এক সময় তার মনে হবে, সত্যিই আমি গাধা আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

এভাবে তার ভেতরের অফুরন্ত সম্ভবনাকে নষ্ট করা হ'ল। সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না। সন্তানকে সবার সামনে কখনও প্রশংসা করতে হবে। উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগাতে হবে। জন্মগত মেধাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের মনের খোরাক মনের খাদ্য হ'ল উৎসাহ, সেটা দিতে হবে। মাঝে মাঝে বলতে হবে 'আমার জিনিয়াস চাইল্ড, তোমাকে নিয়ে আমি গর্ব করি'। দেখবেন সন্তান কত উৎসাহিত হচ্ছে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে পিতা-মাতার এই গর্বকে সমুন্নত রাখতে। সে উচ্ছৃঙ্খল নয় সুশৃঙ্খল পথেই বেড়ে উঠবে। একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়-

ঢাকার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে। সন্ধ্যায় তার পিতা অফিস থেকে এসে ড্রাইং রুমে বসে টিভি চ্যানেল বদলাচ্ছিলেন। মেয়েটি তার পিতার পাশে খুশীমনে বসেছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু তার বাবা তাকে কোন অভিনন্দন জানাননি। মেয়েটি পরে বলল, আমি ভেবেছিলাম পিতা হয়তো খুশী হয়ে আমাকে কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

অনেক অভিভাবক এমনও বলেন, গোল্ডেন জিপিএ ৫ পাওয়া কোন ব্যাপার নাকি! এত প্রাইভেট টিচার, এত কোচিং কয়জন পায়? মেডিকেল, বুয়েট বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হও, তখন বোঝা যাবে! পিতা-মাতা আত্মীয়ের বাড়িতে মিষ্টি পাঠিয়ে আনন্দ করছেন। অথচ এত কষ্ট করে যে এত ভাল রেজাল্ট করল তার মাথায় স্নেহের হাত রেখে বলতে পারছেন না, মহান আল্লাহ আরো বড় করুক তোমায়। কয়জন আমরা এমনটি বলতে পারছি? ভাবখানা এমন যে, প্রশংসা করলে বা ভাল বললে ভবিষ্যতে খারাপ করবে। অথচ সন্তান পিতা-মাতার আনন্দ দেখতে চায়। পেতে চায় তাদের হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসা ও অভিনন্দন। যা তাকে আরও শক্তি ও উৎসাহ জোগাবে। সুতরাং ছেলে/মেয়েদের ভেতরের অসীম ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। পুরস্কৃত করতে হবে। পিতা-মাতার ভালোবাসা ও নেক দো'আ সন্তানের পাথেয় হবে। সাথে সাথে পারিবারিক বন্ধনও সুদৃঢ় হবে।

সন্তান ভুল করলে বা মন খারাপ থাকলে মনে শক্তি জোগাতে হবে :

বয়ঃসন্ধির সময়টিতে সন্তানদের প্রতি মা-বাবার বিশেষ যত্ন, ভালবাসা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের সাথে সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে। ঐ বয়সের গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বিষয়গুলো সহজ ও সরলভাবে মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলে বোঝাতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি করতে ব্যর্থ হন। যেমন- সন্তান কোন ক্ষেত্রে ভুল বা অন্যায় করে ফেলেছে, যাতে সে বিব্রত ও লজ্জিত। সে অপরাধবোধ, সিদ্ধান্তহীনতা নিয়ে হতাশায় ভুগছে। এই নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে তাকে উদ্ধার করে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার শক্তি জোগাবে কে? তার জীবনের সবচেয়ে আপনজন তার পিতা-মাতা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা সঠিক পরামর্শ বা সান্ত্বনা না দিয়ে বকাবকি, অত্যাচার বা অপমান করেন। যার কারণে তার মধ্যে যতটুকু ইতিবাচক এনার্জি ছিল সেটাও ধূলায় মিশিয়ে যায়। অথচ এমতাবস্থায় তার আবেগীয় ভুলগুলো আলোচনা করে তার ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তির গভীরে গিয়ে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন করলেই তার জীবনধারা বদলে যাবে।

আমরা তা না করে মানসিক নির্যাতন করছি। অথচ পিতা-মাতা সন্তানের সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু। ঐ সময় সন্তানের মানসিক শূন্যতা পূরণের দায়িত্ব পিতা-মাতার। সন্তানের

মানসিক বিপর্যয়ের সময় সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন তারাই। এক্ষেত্রে যরূরী বিষয় মনে রাখতে হবে। 'কি ভুল করেছে' সেটার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ 'কেন ভুল করেছে'। পিন পয়েন্ট সমাধানের পথ তখনই সহজ হবে যাতে ভবিষ্যতে এমন ভুল আর না ঘটে।

সন্তানদের কার্যকর সময় দিতে হবে :

সফল মাতা-পিতা হবার গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য হ'ল সন্তানদের সময় দেয়া এবং এক ছাদের নিচে এক সাথে থাকাকে সময় দেয়া বুঝায় না। সন্তান তার ঘরে, আর পিতা-মাতা আরেক ঘরে থাকাকে সময় দেয়া বুঝায় না। কার্যকর সময় দেয়া মানে সন্তানের সাথে ভাব বিনিময় করা সন্তানের সাথে পড়াশোনা, ধর্মীয় আলোচনা, নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া, গল্প করা, মাসে একবার হ'লেও পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। এ বিষয়ে বাচ্চাদের পরামর্শ চাওয়া, কোথায় গেলে ভালো হয়, কিভাবে গেলে ভালো হয় ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত চাওয়া। এতে সন্তানদের দায়িত্ববোধ, গুরুত্ববোধ, সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পায়। পিতা-মাতার সাথে আন্তরিকতা, মুক্তমনে আলোচনার সম্পর্ক ঠিক থাকে। তখন জমে থাকা অনেক কথা, যে কোন পরামর্শ খোলা-মেলাভাবে পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করতে পারে। এতে বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সন্তানরা মুক্ত থাকে। অথচ অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায়, বাচ্চাদের বয়স ১২/১৩ বছর হয়ে গেলে তাদের সাথে তেমন কথা-বার্তা বলা প্রয়োজনবোধ করেন না অভিভাবকরা। অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা বলেন না। এমন অনেক পিতা আছেন সাত দিনে সাতটি কথাও বলেন না। তারা মনে করেন খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজে পড়ানো, প্রাইভেট টিউটর, পোশাক-পরিচ্ছদ, কম্পিউটার, দামি মোবাইল সব কিছুই তো দেয়া হচ্ছে। যা চাচ্ছে সবই তো পাচ্ছে। অপূর্ণ তো কিছু রাখা হয়নি। অথচ সন্তান যতই বড় হৌক তারা চায় পিতা-মাতার আন্তরিক সান্নিধ্য, সাহচর্য, চায় তাদের সাথে প্রাণখুলে কথা বলতে, চায় অন্তরখোলা ভালবাসা। এটা যদি না থাকে তবে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের মানসিক আকর্ষণ তৈরী হবে কিভাবে? রিলেশন থাকে কিভাবে?

সুতরাং সন্তানদের সময় দিতেই হবে। একটি সত্য ঘটনা শুনুন। ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এক প্রখ্যাত চিকিৎসকের সন্তান। তার পিতা সকালে মেডিকেল কলেজে যান এবং বিকালে প্রাইভেট রোগী দেখেন। রাত প্রায় ১২-টার দিকে বাসায় ফেরেন। এটি নিত্য ঘটনা। সন্তান বা স্ত্রীকে সুযোগ দেবার সময় পান না। তার সন্তানটি একদিন বাবার সাথে বিকেলে নভোথিয়েটারে বেড়াতে যেতে চেয়েছিল, পিতা সময় দিতে পারেননি, রোগী দেখার ব্যাপার আছে। ঐ ছেলে মা, মামা, চাচা, খালুর নিকট থেকে পাওয়া, এমনকি টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে ছয় হাযার টাকা জমিয়ে একটি খামে ভরে সবিনয়ে পিতাকে দিয়ে বলেছিল, 'আব্বু! এই তোমার ছয় হাযার টাকা'। আগামীকাল তিন ঘণ্টা আমাকে নিয়ে বিকালে বেড়াতে যাবে। ঐ শিশু হিসাব করে দেখেছে, তিন ঘণ্টায় তার বাবা ঐ পরিমাণ টাকা আয় করেন। সুতরাং একটি ছোট্ট শিশু আর কি-ই-বা করতে পারে! এর পরেও কি পিতা-মাতাদের চেতনা ফিরে আসবে না? এত অর্থ সম্পদ কার জন্য? কিসের জন্য এত পরিশ্রম? কিসের জন্য এত ত্যাগ? পরিবারের তথা সন্তানদের সুখের জন্যই তো? তবে কোথায় সেই সুখ? সুতরাং পিতা-মাতাকে ভাবতে হবে। সারাজীবন পিতা-মাতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত এই সন্তানগুলো যখন বড় হয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি স্নেহের দৃষ্টি দিতে ভুলে যাবে, ন্যূনতম দায়িত্বটুকু পালন করতে অবহেলা করবে, তখন হয়ত সেদিনগুলির কথা মনে আসবে। কিন্তু তখন তো আর এসব ভাবনার কোন মূল্য হবে না। সুতরাং আসুন! এখন থেকেই সাবধান হই।

শিশুর সামনে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে :

শিশুরা ৫ মাস বয়স থেকেই কথাবার্তা বুঝতে শুরু করে। তাই এ সময় থেকেই শিশুর সামনে সতর্ক থাকতে হবে। পিতা-মাতা খারাপ আচরণ করলে শিশুর উপর প্রভাব পড়ে। এসময় বাচ্চারা অনুকরণের চেষ্টা করে। মা জোরে কথা বললে শিশুও জোরে কথা বলতে শিখে। বাবা-মা ঝগড়া করলে সেও ঝগড়াটে হয়। মা সবসময় ধমকা-ধমকি করলে শিশু বদমেজাজী হয়ে ওঠে। এমনকি শিশুকে মারধর করলে সে পরে বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে মারমুখো আচরণ করে। তাই বাবা-মাকে শিশুর সামনে কথাবার্তা ও ব্যবহারে খুব সাবধানী হ'তে হবে। আর বাবা যদি বদমেজাজী হন, তাহ'লে ঝগড়ার সময় মাকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। শিশু বড় হয়ে বুঝতে শুরু করলে সে মায়ের সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতায় মুগ্ধ হবে। তখন মায়ের ঐ গুণগুলো সে নিজেও অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সুবিবেচক ও দূরদর্শী হ'তে হবে :

শিশুর মন বুঝতে হবে। সে কাঁদলেই মা নাচিয়ে, দুলিয়ে, ধমকিয়ে, শিস বাজিয়ে, কখনও চড়-থাপ্পড় মেরে শান্ত করার চেষ্টা করেন। অথচ শিশুর কি প্রয়োজন, সেটি বুঝে উঠতে পারেন না। একটু খোঁজ করলেই তার সমস্যার কারণ মা বের করতে পারেন। এজন্য মাকে বিচক্ষণ হ'তে হবে। মোটকথা শিশুর সামনে রাগ দেখানো, মারধর, জোরে চিৎকার অযথা ধমকানো থেকে বিরত থেকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। উন্নত জীবন গড়ার জন্য সন্তানের মনোভাব বোঝাটাও একান্ত যরূরী। তাই শৈশব কাল থেকে সন্তানের মনোভাব বুঝে তার আগ্রহের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে হবে।

সৎসঙ্গ ও সুস্থ পরিবেশে গড়ে তোলার চেষ্টা করা :

স্কুল-কলেজে পড়া অবস্থাতেই অনেক ছাত্রের মধ্যে নেশা করার প্রবণতা দেখা দেয়। নেশাখোর ছাত্ররা অন্য ভালো ছাত্রদেরও নেশা করায় উদ্বুদ্ধ করে। মা-বাবাকে এ ব্যাপারে সন্তানকে স্কুলে ভর্তির সময় থেকে সাবধান ও সচেতন করতে

হবে। অনেক ছাত্র দল বেঁধে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে। আবার অনেকে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, সন্ত্রাস, ছিনতাইয়ে জড়িত হয়। ছোটবেলা থেকে এসব অপকর্মের বিষয়ে সচেতন করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। আর সব ছাত্র-ছাত্রীই খারাপ নয়। তাই যেসব ছাত্র লেখাপড়ায় ভালো, নিয়মিত ক্লাস করে, মেধাবী, আচার-আচরণে ভালো, উচ্চ নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন, লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে জড়িত, এমন ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের মিশতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিদিন সন্তানের খোঁজ-খবর নিতে সপ্তাহে একবার করে হ'লেও স্কুলে যেতে হবে। পিতা-মাতা বুঝবেন তার সন্তানের হাল-হকিকত। বস্তুতঃ প্রথম থেকেই সন্তানের আদর্শ মনোভাব গড়ার দায়িত্ব পিতা-মাতার।

সত্য কথা বলা ও ওয়াদা পালনের শিক্ষা দেওয়া :

সদা সত্য কথা বলবে। এ উপদেশবাণী যতই স্কুলে আওড়ানো হোক না কেন, যখন ঘরে পিতা-মাতাকে মিথ্যা বলতে দেখবে তখন শিশুটি মিথ্যাকে আর দোষণীয় মনে করবে না। জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলবে। তাই উন্নত জীবনের জন্য পিতা-মাতাকে শিশুর সামনে সত্যের চর্চা করা কর্তব্য। ওয়াদা পালনের গুণটিও শিশুকাল থেকে শেখানো যরূরী। ওয়াদা পালনের গুণটি অর্জন করলে দেশ ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সে সচেতন হয়। ভবিষ্যতে লেখাপড়াসহ অন্যান্য যে কোন কাজে সহজে সফল হয় এবং সুনাম অর্জন করে।

শিশুর সামনে আদর্শ মডেল তুলে ধরতে হবে :

শুধু তত্ত্ব কথায় শিশুকে বোঝানো কষ্টসাধ্য। তাই তার সামনে চরিত্র গঠনের বিষয়গুলো কাহিনী অবলম্বনে শোনালে তা তার মনে সহজে রেখাপাত করবে। আজকাল অনেকে বাচ্চাদের হাতে কল্পকাহিনী জাতীয় বই তুলে দিচ্ছেন। এসব বইয়ের গল্পগুলো অবাস্তব, অসত্য ও অলীক। যা শিশুদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে রাখে। বাজারে সত্য কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন গল্পের বই পাওয়া যায়। এছাড়া মনীষীদের জীবনকাহিনী, তাদের ধৈর্য, পরিশ্রম ও উন্নত চরিত্রের গল্প ইত্যাদি শিক্ষণীয় বইপত্র তাদেরকে পড়ে শুনান। অতঃপর পড়তে শিখলে তাদের হাতে সেগুলি তুলে দিন।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে :

বিষয়টি সবশেষে আনা হ'লেও এটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক শিক্ষা দেয়ার পদক্ষেপ শিশুকাল থেকে নিতে হবে। চরিত্র গঠন ও উন্নত জীবনের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করার কোন বিকল্প নেই। এতে করে শিশুর মনে যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়, তা তাকে যে কোন খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। বাবা-মাকে সম্মান করা, প্রতিবেশীকে শ্রদ্ধা করা, সৎপথে চলা, ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো একটি শিশুর জীবনকে সুন্দর করে তোলে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, নৈতিক শিক্ষা দেয়ার জন্য পিতা-মাতাকে সর্বাগ্রে উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হ'তে হবে। আর নৈতিক অবক্ষয় থেকে শিশুকে বাঁচানোর একমাত্র পথ তার হৃদয়ে গভীর ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ধর্মীয় কাহিনীগুলো শিশুকে শোনানোর কোন বিকল্প নেই। আজ ইউরোপ-আমেরিকাতেও একটা শ্লোগান বেশি শোনা যাচ্ছে, তা হ'ল Back to the religion. পাশ্চাত্যের একজন মনীষী তাই বলেছিলেন, ধর্ম বাদে অন্য কোন শিক্ষাই সৎ মানুষ গড়ার জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা নয়।

গবেষণার মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশের পথ, চরিত্র উন্নয়নের নানা কর্মকৌশল ও শিশু অপরাধ দমনের আরও অনেক রাস্তা বের করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন সরকারী উদ্যোগ। মোটকথা, বর্তমান সময়ে শুধু স্কুল-কলেজের উপর ভরসা করে শিশুদের ছেড়ে দিলে আমাদের শিশুরা আদর্শবান উন্নত মানুষরূপে গড়ে ওঠার পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা যে কত বেশী, তা আশপাশের সমাজ চিত্র দেখলেই সহজে অনুমিত হয়। এজন্য শিশুদের মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হবে পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক সবাইকেই। যেহেতু একজন মা একটি শিশুর সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে বেশী সময় শিশুর পাশে থাকেন, সেহেতু মা-ই পারবেন শিশুকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে বাবার সহযোগিতাও অপরিহার্য। সর্বোপরি প্রয়োজন সরকারের দূরদৃষ্টি ও কার্যকর শিক্ষানীতি, যার আলোকে একটি শিশু পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পারে।

একটি মজার কথা বলে আজকের প্রবন্ধ শেষ করব। এক অভিভাবক সন্তানকে সঠিক নিয়ম-কানূনে মানুষ করতে না পেরে শেষে তার এক আত্মীয়কে বলছেন, 'সন্তান কোন কথাই শুনে না। কি আর করব আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিয়েছি'। কি আশ্চর্য স্রষ্টা আপনাকে সন্তান দিয়ে মানুষ করার দায়িত্ব আপনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আর আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের করণীয় ছেড়ে দিচ্ছেন। এটা কোন দায়িত্বশীল সচেতন মানুষের কাজ নয়। নিশ্চয়ই এটি আপনার জন্য পরীক্ষা। আপনি দায়িত্ব এড়াচ্ছেন কেন? ধৈর্য ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে সন্তানকে আদর্শ মানুষ করার ব্রত নিয়ে। তাহ'লে এটা সহজ হবে।

আজ অধিকাংশ পরিবারে পিতা-মাতার সাথে সন্তানদের দূরত্ব বাড়ছে। ব্যস্ত জীবনের জন্যই হোক, প্রযুক্তির যুগকে দোষ দিয়েই হোক। ভাবতে হবে সমস্যাটি কোথায়? পারিবারিক শিক্ষা, সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধ, পিতামাতার দায়িত্ব, শিক্ষকদের মহান ব্রত। সমাজ সচেতনতার এক সামগ্রিক কার্যক্রম একটি শিশুকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। আসুন, আমরা যার যার অবস্থান থেকে আদর্শ সন্তান তথা আদর্শ পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

বালাকোটের রণাঙ্গনে

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

১.

চলতি বছরের জানুয়ারীতে পেশোয়ার যাওয়ার পথে 'নওশেরা' নামটি চোখে পড়তেই হৃদকম্পন দিয়ে কল্পনায় ভেসে উঠেছিল সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রহ.), শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন তথা বৃটিশ ও শিখবিরোধী 'জিহাদ আন্দোলন'-এর অম্লান স্মৃতি। খাইবার-পাখতুনখোয়া তথা তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বড় একটা অংশ ছিল এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। তখন থেকেই এই জিহাদ আন্দোলনের সর্বাধিক তাৎপর্যময় অধ্যায় ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধের স্থানটি স্বচক্ষে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। মাঝখানে দেশে যাওয়া, দুই সপ্তাহ পর দেশ থেকে ফিরে এসে মিড টার্ম পরীক্ষা দেয়া ইত্যাদির কারণে বেশ ব্যস্ততা ছিল। অবশেষে পরীক্ষার পর সর্বপ্রথম পরিকল্পনাতেই বালাকোট সফরটা চূড়ান্ত করে ফেললাম।

মারদানের এক ক্লাসমেট আনওয়ারুল হককে বলে রেখেছিলাম সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য। কিন্তু নির্ধারিত দিন ২৫ এপ্রিল'১৪ সকালে সে জানালো বিশেষ কারণবশতঃ যেতে পারছে না। ভাবলাম তাহলে অপর কোন সঙ্গী পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এমন অপরিচিত গন্তব্যে একাকী যাওয়াটা সুবিবেচনার কাজ হবে না। ভাষাগত সমস্যাও আছে। কেননা ওদিকের লোকজন হিন্দকো ভাষী (যদিও পরে দেখলাম উর্দূ ও হিন্দকোর মধ্যে তেমন একটা তফাৎ নেই)। কিন্তু নিয়ত যখন করে ফেলেছি এবং সফরের প্রস্তুতিও যখন নিয়ে ফেলেছি, তখন সফর তো অর্ধেকটা হয়েই গেছে। এমতাবস্থায় পিছুটান দিতেও মনটা সায় দিচ্ছে না। তাছাড়া সত্যি বলতে একাকী সফরে আমার খুব একটা আপত্তি নেই। বরং ভালই লাগে। অনুভূতির জগতকে উজাড় করে দিয়ে নিজের মত করে সব কিছু দেখা, নিজের মত করে বোঝা, নিজের মত করে অনুভব করার মধ্যে অন্য রকম এক আনন্দ আছে। অনেকটা ধ্যানমগ্ন সাধক তার নিবিড় সাধনায় যে পরিতৃপ্তির খোঁজ পায় তেমন। তাই আর দেরী করলাম না। অন্তর্জগতের শত-সহস্র অধরা অনুভবকে সঙ্গী করে বেশ প্রসন্নচিত্তে একাকীই রওনা হলাম। পেশোয়ার অভিমুখী জিটি রোড ধরে টাক্সিলা ওয়াহ ক্যান্টনমেন্ট, তারপর হাসান আবদাল থেকে রাইট টার্ন নিয়ে কারাকোরাম হাইওয়ে (এন-৩৫) ধরে হরিপুর যেলায় ঢোকার পর হায়েস মাইক্রোবাসটি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার রওনা হয় এ্যাবোটাবাদের পথে। রাস্তার দু'ধারে বেশ দূরে বৃক্ষহীন অথচ সবুজ ঘাস, লতাগুল্মে ভরা পাহাড়ের দীর্ঘ সারি। সমভূমি ছেড়ে ঐসব পাহাড়ে বহু মানুষের বসবাস। গাড়ি এগিয়ে যায় একের পর এক পাহাড়ী জনপদ পেরিয়ে। বিশাল সরীসৃপের মত পাহাড়ের সারিও ধীরলয়ে পিছুপথে হারিয়ে যায়। শূন্য বোবা দৃষ্টি সেদিকে লেগে থাকে আঠার মত। ইত্যবসরে স্মৃতির মণিকোঠায় ডানা ঝাপটা দিয়ে উড়ে বেড়ায় নানান রঙে রঙিন মুক্ত বিহঙ্গরা। দেশের বাইরে আসার পর থেকে একটু অবসর মিললেই এই কাল্পনিক বিহঙ্গদের সাথে দেশের মাটি এক ঝলক ছুঁয়ে আসতে খুব তৃপ্তিবোধ হয়।

বেলা ১১টার দিকে ওরাশ উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র এ্যাবোটাবাদ শহরে পৌঁছলাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪২০০ ফুট উচ্চতায় অনিন্দ্য সুন্দর একটি পাহাড়ী শহর এ্যাবোটাবাদ। অফিস-আদালত ও আবাসিক বাড়িঘরে জমজমাট পাহাড়গুলো। শহরে ঢোকার মুখে 'ফোয়ারা চক' থেকে ডানদিকে টার্ন নেয়ার পর নজরে আসে ঝকঝকে সাজানো-গোছানো এ্যাবোটাবাদ শহর। গত বছর ডিসেম্বরে একবার এসেছিলাম এ্যাবোটাবাদে। কিন্তু শহরে ঢোকা হয়নি। গলফ ক্লাব থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে গালিয়াত ও মারীর পথে যাত্রা করেছিলাম। এবার শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী এরিয়া সেজন্য কি না জানি না, পুরো শহরটা খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হল। মেইন রোড থেকে এক-দেড় কিলোমিটার পূর্বে আবাসিক এলাকা বিলাল টাউন। এখানেই পাকিস্তান মিলিটারী বাহিনীর নাকের ডগায় 'ওয়াযিরিস্তান হ্যাভেলী' নামক একটি বাড়ীতে নাকি ওসামা বিন লাদেন প্রায় ৫ বছর বসবাস করেছিলেন। ৩ বছর আগে ২০১১ সালে ২রা মে রাত ১ টায় মার্কিন বাহিনী চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে একজন মহিলাসহ বাড়ির ৫ সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। যাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয় ওসামা বিন লাদেন হিসাবে। সত্যিই তিনি ওসামা বিন লাদেন ছিলেন কি না এ নিয়ে প্রবল বিতর্ক থাকলেও সেসময় এ্যাবোটাবাদ শহরটির নাম বিশ্বব্যাপী প্রচার পায়। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাক সরকার ঐ বাড়িটি ধ্বংস করে ফেলে এবং সম্প্রতি নাকি সেখানে বিনোদন পার্ক বানানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৩ বছর আগের সেই রহস্যময় ঘটনাটি মনে পড়তে নিঃশ্বাসটা হঠাৎ ভারী হয়ে আসে। চোখের সামনে ভেসে উঠে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের অত্যাচার-নিপীড়নের সকরুণ চিত্র। দেহ-মন জুড়ে হঠাৎ প্রবল বিদ্রোহ জেগে উঠে আবার ব্যর্থতার হতাশায় নিস্তেজ হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে বদ্ধমুষ্ঠিতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করি।

আধাঘণ্টা বাদেই গাড়ি আরেক পাহাড়ী শহর মানসেহরায় প্রবেশ করে। শহরে ঢোকার পূর্বেই দিগন্তের প্রান্ত রেখাজুড়ে অদ্ভুত ধরনের শুভ্র মেঘের রাজ্য দেখে দ্বিধান্বিত হলাম। একটু পরেই বোঝা গেল ওগুলো মেঘ নয়, বরফের টুপি পরিহিত সুউচ্চ পর্বতমালা। বরফঢাকা পাহাড় এর আগেও

* *এমএস (হাদীছ) অধ্যয়নরত, ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।*

দেখেছিলাম ইসলামাবাদের নিকটস্থ শহর মারীতে, দেখেছিলাম সেখানে বরফবারী অর্থাৎ তুষারপাতের অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু দিগন্তের প্রান্তসীমা ঘিরে এমন সুউচ্চ সফেদ পাহাড় দেখার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। শহরের উঁচু অংশে মূল শহরটা গড়ে উঠেছে। আর নীচ অংশে সমতলের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় লক্ষ মানুষের বসতি। উপর থেকে সেদিকে তাকালে সবুজে সবুজে চোখ ভরে যায়। সাদা পাহাড়ের নীচে সবুজের নয়নাভিরাম কারুকার্য সেখানে এক নিদারুণ নৈসর্গিক দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছে। আয়তন ও জনসংখ্যায় বেশ বড় শহর এই মানসেহরা উপত্যকা হাযারা ডিভিশনের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে।

মটরস্টান্ডে নেমে আশপাশের লোকজনের সাহায্য নিয়ে সোজা বালাকোটগামী মাইক্রোর স্টপেজে চলে আসলাম। বিশাল এই মটরস্টান্ডে বাসের সংখ্যা খুবই কম। চারিদিকে কেবল মাইক্রোর সারি। সাড়ে বারোটার দিকে নির্ধারিত মাইক্রোটি ছাড়ল বালাকোটের উদ্দেশ্যে। মানসেহরা থেকে উত্তরের পথে দু'টি হাইওয়ে চলে গেছে। একটি উত্তর-পূর্বে বালাকোট এবং কাগান-নারান উপত্যকার দিকে। পর্বতময় এই রাস্তাটি ভারী তুষারপাত এবং ল্যান্ডস্লাইডিং-এর কারণে বছরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। অপরটি উত্তর-পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত সমতল কারাকোরাম হাইওয়ে ধরে বাট্টাগ্রাম ও বেশামের দিকে। উভয়টি ফের মিলিত হয়েছে চিলাস ট্রানজিট পয়েন্টে। উত্তরাঞ্চলে তথা গিলগিট, স্কার্দু বা চীন যাওয়ার জন্য এই চিলাস পয়েন্ট অতিক্রম করা আবশ্যক।

আমরা রওনা হলাম উত্তর-পূর্বমুখী নারান-কাগান রোড ধরে। মানসেহরা থেকে বালাকোটের দূরত্ব প্রায় ৪০ কি.মি.। সময়ও লাগে ৪০ মিনিটের মত। উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সুপরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হাইওয়েটি সর্পিলভাবে এগিয়ে গেছে। ডানদিকের সমতলে বহু নীচে ক্ষীণকায় ফিতের মত নজরে আসে কুনাহার নদী। তার ওপাশে আবার উঁচু আকাশছোঁয়া পাহাড়ের সারি। তার পিছনেই আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুযাফফরাবাদ। আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথা তো বলাই বাহুল্য। এ পথে যত এগোনো যায় প্রতিটি মুহূর্তে ততই মুখোমুখি হতে হয় রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্যের। যা কেবল চোখেই দেখা যায়, কেবল অনুভবই করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ইসলামাবাদ থেকে শুরু করে চিত্রাল, গিলগিত-বালতিস্তান ও কাশ্মীরের দিকে প্রতিটি ভ্যালিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই বিপুল পসরা পরস্পরের সাথে পাল্লা করে চলেছে। প্রায় আধাঘণ্টা পর ত্রিভুজাকৃতির তুষারাচ্ছাদিত পর্বতচূড়াকে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ধরে রাখা নয়নাভিরাম ছোট্ট বালাকোট শহরে প্রবেশ করি। মেইন রাস্তাটা কুনহার নদীর একেবারে কিনার ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। আবেগের ব্যাপারগুলোতে আমি বরাবরই কঠোর রক্ষণশীল। কিন্তু প্রবল খরস্রোতা কুনহার নদীকে এত কাছ থেকে দেখে আবেগ আর ধরে রাখা গেল না। শেষপর্যন্ত জিহাদী রণাঙ্গন বালাকোটের সীমানায় পা রেখেছি..!! ঐতিহাসিক কুনহার নদীর কলধ্বনি সরাসরি এসে কানে বাজছে..!! এ যেন বাস্তব নয়, কোন অলীক স্বপ্ন!!

স্বপ্নঘোরে ছেদ পড়ল শহরের প্রবেশমুখে রাস্তার ধারেই মসজিদ থেকে ভেসে আসা খুৎবার আওয়াযে। সেদিকে তাকাতেই দেখলাম বড় করে লেখা 'জামে মসজিদ উম্মুল কুরা আহলেহাদীছ'। যাত্রার আগে তাহের ভাইয়ের কাছে ফোন দিয়েছিলাম বালাকোটে আহলেহাদীছদের অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য। উনি এটুকুই জানাতে পেরেছিলেন যে, বাযারে একটা আহলেহাদীছ মসজিদ আছে। কিন্তু এটা তো বাযার মনে হচ্ছে না! এখানেই নামব নাকি সামনে নামব এই ভাবনার মধ্যেই গাড়ি প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে বালাকোট বাযারে এসে থেমে গেল। জুম'আর ছালাতের সময় প্রায় হয়ে গেছে। তাই বাযারে নামার পর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা পিছনে ফেলে আসা মসজিদের দিকে হাঁটা ধরলাম। সরকারী মোটেলটি (পিটিডিসি) পার হয়ে পেট্রোল পাম্পের সাথে লাগোয়া মসজিদটি। মসজিদে ঢুকে ওযূ শেষ করতেই ইক্বামত শুরু হয়ে গেল। ছালাত শেষ হওয়ার পর বাইরে খত্বীব ছাহেবের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম খত্বীব ছাহেব বেরিয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। তার কাছেই জানতে চাইলাম এখানে কোন আহলেহাদীছ মারকায আছে কি না। উনি উত্তর না দিয়ে আমার আপাদমস্তক পরখ করে দেখার চেষ্টা করলেন। আমার উর্দূ বলার ভাঁজ শুনেই উনি যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন। তাই বিস্তারিত কিছু আর বলার প্রয়োজন হ'ল না। সোজা নিয়ে গেলেন মসজিদ সংলগ্ন 'ফালাহে ইনসানিয়াত ফাউণ্ডেশন পাকিস্তান' পরিচালিত ফিল্ড হসপিটালে। ২০০৫ সালে ভূমিকম্পের পর অস্থায়ী হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল। ভিতরে ঢোকার পর মসজিদের খত্বীব জনাব ইউসুফ ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হল। উনার বাড়ী মুযাফফরাবাদে। সেখানে এক আহলেহাদীছ মাদরাসার মুহতামিম। প্রতি শুক্রবার এখানে এসে খুৎবা দিয়ে যান। আমার বালাকোট সফরের উদ্দেশ্য জানার পর উনি যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখালেন এবং হাসপাতালের দায়িত্বশীল ভাইদেরকে সার্বিক ব্যবস্থা করতে বললেন। ফিরে যাওয়ার সময় মুযাফ্‌ফরাবাদে উনার মাদরাসা সফরের জন্য দাওয়াত দিলেন এবং ঠিকানা লিখে দিলেন। দুপুরে সবাই একসাথে খেলাম। তারপর একে একে স্টাফদের সাথে পরিচয় হ'ল। সবাই স্থানীয়। কেবল ডাক্তার আব্দুল্লাহ ছাহেব বহিরাগত। উনি কোয়েটার খারান মরুভূমি অঞ্চলের মানুষ, তবে অন্তরটা মরুদ্যানের মতই সজীব। হাসপাতালের পরিচালক দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী জনাব সাজ্জাদ দুররানী এখানকার দ্বিতীয় প্রজন্মের আহলেহাদীছ। উনার বাবা বালাকোটে প্রথম আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। এছাড়া তাজ মুহাম্মাদ, এহসান এলাহী যহীর, যাহেদুর রহমান, নাদীম মালিক, শাহেদুর রহমান, দিলদার প্রমুখ আরও যারা স্টাফ ছিলেন তারা সবাই নব আহলেহাদীছ। খাওয়ার পর ওনাদের সাথে

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। সত্যি বলতে পাকিস্তান আসা পর্যন্ত একটানা এতক্ষণ যাবৎ উর্দূতে কথা বলার সুযোগ হয়নি। এই মফস্বলের পরিবেশে অকৃত্রিম মাটির মানুষদের সঙ্গ পেয়ে সে সুযোগটা মিলল। সামান্য ভুল-ভ্রান্তি হলেও জড়তা বেশ কেটে যাচ্ছে তা অনুভব করতে পারলাম। ওদিকে বাইরে প্রবল বর্ষণ শুরু হ'ল। পাহাড়ের ঘেরাটোপের উপর আকাশের এক চিলতে উন্মুক্ত ছাদে জমাট কালো মেঘ প্রায় আঁধারই নামিয়ে দিয়েছে উপত্যকায়। আছরের পরও বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। দারুণ উপভোগ্য সে বৃষ্টি। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর কবর আজই যিয়ারত করতে চাই। অবশেষে মাগরিবের একটু আগে বৃষ্টি থেমে গেলে যাহেদ ভাইয়ের সাথে মটর সাইকেলে রওয়ানা হলাম সাতবানে ঝর্ণার উদ্দেশ্যে।

২.

বালাকোট শহরটা খুব ছোট্ট ও ছিমছাম। কোলাহল নেই একেবারেই। দু'দিকে আকাশছোঁয়া কালুখান আর মেট্টিকোট পর্বত আর মধ্যখানে সশব্দে বহমান কুনহার নদী। উত্তরদিকের 'মূসা কা মুছাল্লা' পর্বতের বরফঢাকা চূড়া উপত্যকার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। নদীর দু'পাড়ে গড়ে উঠেছে শহর। প্রায় লক্ষাধিক মানুষের বসবাস এই উপত্যকায়। কাগান ভ্যালির লুলুসার ঝিলের বরফগলা পানি থেকে উৎপত্তি লাভ করা কুনহার নদী অবশেষে আযাদ কাশ্মীরের ঝিলাম নদীতে গিয়ে মিশেছে। বড় বড় পাথরে ভরা নদীটি অসাধারণ সুন্দর। ভয়ংকর স্রোত আর বরফশীতল পানি। পাথরের ফাঁক গলিয়ে সগর্জনে যে তীব্রতায় পানির স্রোত ধেয়ে আসে তাতে এটি নদী নয় বরং শক্তিশালী পাহাড়ী ঝরণা ভেবে ভ্রম হয়। সব মিলিয়ে বালাকোট এখন একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট। পর্যটকদের রাত্রিযাপনের জন্য কুনহার নদীর দুকূল ঘিরে গড়ে উঠেছে বহু আবাসিক হোটেল। এলাকার জনগণের আয়ের অন্যতম উৎস এই পর্যটন খাত। মেইন রোডটা বাযারের মধ্য দিয়ে বালাকোট ব্রীজ অতিক্রম করে ফের উর্ধ্বগামী হয়ে উঠে গেছে ছবির মত সুন্দর অপর এক পাহাড়ী উপত্যকা কাগান-নারানের দিকে। ২০০৫ সালের ৮ই অক্টোবর এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে বালাকোট শহর প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। নিহত হয়েছিল প্রায় ২০ হাযার মানুষ। পরবর্তীতে সঊদী আরব ও আরব আমিরাত সরকারের সহযোগিতায় শহরটি আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ বাড়িঘর রিলিফের লাল নীল বর্ণের টিন দিয়ে তৈরী। শহরের সর্বত্রই লাল-নীলের বাড়তি আধিপত্যটা চোখে পড়ে। ভূমিকম্পের সেই স্মৃতি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট আজও খুবই টাটকা। অধিকাংশই স্বজনহারা হয়েছিলেন সেদিন। পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছিল সেদিন কাশ্মীর ও খাইবার-পাখতুনখোয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। বর্তমানে গোটা বালাকোট শহর স্থানান্তর করে নিউ বালাকোট সিটি নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে ২৫ কি.মি. দূরবর্তী বিকরাল এলাকায়। কেননা বর্তমান বালাকোট শহরটি ভূমিকম্পের দু'টি মারাত্মক ফল্ট লাইনের উপর সরাসরি পড়েছে। তাই যেকোন সময় এখানে আবার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা বাপ-দাদার ভূখণ্ড ছাড়তে একদম রাযী হচ্ছে না। সরকারীভাবে শহরটিকে 'রেড জোন' হিসাবে ঘোষণা করা হলেও তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল। তবে সরকার ঘোষণা মোতাবেক নিউ বালাকোট সিটির নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেছে।

১৮৩১ সালের ৬ই মে তারিখে এই পাহাড়ঘেরা বালাকোটের প্রান্তরে ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক অধ্যায় রচিত হয়। শিখ ও বৃটিশবিরোধী ঐতিহাসিক জিহাদ আন্দোলন তথা উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান দুই সিপাহসালার সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এবং শাহ ইসমাঈল (রহ.) শত্রুপক্ষের হাতে নিহত হন এই ভূখণ্ডে সংঘটিত যুদ্ধে।

১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাস। পেশোয়ার সীমান্ত ঘাঁটি পাঞ্জতার থেকে কাশ্মীর গমনের সিদ্ধান্ত নেন সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)। মুনাফিক পাঠান সর্দারদের বারংবার বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। মুজাহিদ বাহিনীও নানা বিপর্যয়ের শিকার হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি বর্তমান হাযারা ডিভিশনের উচ্চভূমি অতিক্রম করে মুযাফফরাবাদের পথে রওয়ানা হন এবং কাশ্মীর প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পর্বতঘেরা বালাকোট উপত্যকায় এসে শিবির স্থাপন করেন। এ খবর মুনাফিকরা শিখদের কাছে পাচার করে দিয়েছিল। ফলে শিখ সেনাপতি রনজিৎ সিং-এর পুত্র শের সিং একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করল। সাইয়েদ আহমাদ শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। মূল যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল বালাকোট শহরের পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণমুখী একটি কৌশলগত অবস্থানে। যার দক্ষিণে রয়েছে বালাকোট জনপদ থেকে সাতবানে ঝরণার পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি, আর উত্তরে মেট্টিকোট টিলার উন্মুক্ত পাদদেশ। আত্মবিশ্বাসী সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বিচক্ষণতার সাথে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং মেট্টিকোট টিলার পাদদেশে ও সাতবানে ঝর্ণার আশপাশে মুজাহিদ বাহিনী মোতায়েন করলেন। কিন্তু মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও ৫ই মে তারিখে বিপরীত দিক থেকে বিপুল সংখ্যক শিখ মেট্টিকোট পর্বত শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। ফলে নিম্নাঞ্চলে শিবির স্থাপনকারী মুজাহিদগণ তাদের আয়ত্বের মধ্যে চলে আসে। পরদিন ৬ই মে শুক্রবার শুরু হয় ১০,০০০ শিখ সেনার বিরুদ্ধে ৭০০ মুজাহিদের অসম যুদ্ধ। প্রায় ২ ঘণ্টা স্থায়ী যুদ্ধে শত্রুদের সুবিধাজনক অবস্থান, মুজাহিদদের সংখ্যাল্পতা, রসদপত্রের স্বল্পতা, মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতাসহ নানা কারণে মুজাহিদ বাহিনী সুবিধা করে

উঠতে পারল না। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অকস্মাৎ সাতবানে ঝর্ণার মধ্যে মুজাহিদ নেতা সাইয়েদ আহমাদ এবং শাহ ইসমাঈল শত্রুর হাতে নিহত হন। নিহত হন আরো বহুসংখ্যক মুজাহিদ। এভাবে পরাজয় ঘটল ক্ষুদ্র অথচ অমিত সাহসী এই মুজাহিদ বাহিনীর। সেই সাথে পরিসমাপ্তি ঘটল উপমহাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম পরিচালিত বৃটিশবিরোধী শক্তিশালী আন্দোলনটির। শিখরা সেদিন তাদের অভ্যাস মোতাবেক যুদ্ধ শেষে বালাকোটের বাড়িঘর পুড়িয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সবচেয়ে ক্ষতি হয় সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ও সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদের রচিত ও সংগৃহীত বহু কিতাবের পাণ্ডুলিপি, যার প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। যার মধ্যে ছিল সাইয়েদ আহমাদ শহীদের রচিত রোজনামচা 'নূরে মুহাম্মাদী'ও।

বালাকোট উপমহাদেশের অন্যান্য সকল স্থানের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের মাইলফলক হিসাবে। ঘটনাক্রমে বালাকোটের এই মর্মান্তিক স্মৃতিই উপমহাদেশের সর্বপ্রথম এই সুসংবদ্ধ ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের প্রতীক হয়ে এতদঞ্চলের মুসলমানদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন দখল করে আছে। বালাকোটের এই জিহাদে জয়লাভ করলে উপমহাদেশের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হ'ত। সাইয়েদ আহমাদ শহীদ চেয়েছিলেন বালাকোটের এই যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে ঝিলাম নদীর তীরবর্তী সমস্ত ভূখণ্ড এবং কাশ্মীর রাজ্যকে পূর্ণভাবে করায়ত্ত করতে। চেয়েছিলেন বৃটিশ বিরোধী জিহাদের একটি শক্ত ঘাঁটি গড়তে। শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা পূরণ না হলেও পরবর্তীকালের ইতিহাসে বালাকোটের আত্মত্যাগের মহিমা যেভাবে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের হৃদয়ে যে আবেগ নিয়ে তা চিরজাগরুক হয়ে রয়েছে, তা যুদ্ধজয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বালাকোট জিহাদে বাঙ্গালীদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ঐতিহাসিক গোলাম রাসূল মেহের ৫ জন বাঙ্গালী শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, থিসিস পৃ. ২৮৪)*। এছাড়া মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালীসহ প্রায় ৪০ জন আহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়, যারা যুদ্ধ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

৩.

বৃষ্টিভেজা রাস্তা দিয়ে বাযারের মধ্যে ঢুকলাম। বাযারের সবচেয়ে বড় মার্কেট মাদানী প্লাজা থেকে বামদিকে একটি গলিপথ চলে গেছে। তার প্রবেশমুখে ছোট্ট সাইনবোর্ডে তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা 'শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর মাযার'। এই গলিপথ দিয়ে সামান্য এগুলেই রাস্তা দু'ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে দক্ষিণে মেট্রিকোটের দিকে, অপরটি উত্তরে আংগ্রাইয়ের দিকে। আংগ্রাইয়ের দিকে কিছুদূর যাত্রার পর পাহাড়ের বাঁক থেকে বেরিয়ে আসতেই নজরে আসল সাতবানে ঝরণা। সবুজ ঘাসের যমীন আর বড় বড় পাথরে ভরা অনেকটা চওড়াকৃতির ঝরণা। দেখতে অনেকটা নদীর মতই মনে হয়, তবে বিভিন্ন পাহাড় থেকে নেমে আসা শীর্ণ কয়েকটি জলধারা ব্যতীত আর সব শুকনো। ঝরণাগুলো মিলিত হয়েছে বেইলী ব্রীজটির কাছাকাছি এলাকায়। এই বেইলী ব্রীজ পার হলেই নীচ থেকে অনেক উঁচু করে বাঁধানো শাহ ইসমাঈল শহীদ এবং অপরাপর শহীদানের কবরস্থান। ব্রীজের মুখে বিশালাকার কিছু পাথরের স্তূপ। তার মধ্যে একটির গায়ে লেখা, 'সাইয়েদ আহমাদ শহীদের শাহাদাতলাভের স্থান'। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর ব্রীজ পার হয়ে কবরস্থানের গেটে আসলাম। কবরস্থানের বিপরীত দিকে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, 'জামে মসজিদ শাহ ইসমাঈল শহীদ (র.)'। যুদ্ধকালীন সময়ে এটিই মসজিদে জেরিন ছিল কিনা, কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেও নিশ্চিত হওয়া গেল না। আমরা প্রাচীরঘেরা কবরস্থানের ভিতরে ঢুকলাম। সারিবদ্ধভাবে ১৫/২০টি কবর। কেবল পূর্বকোণে শাহ ইসমাঈল শহীদের কবর ছাড়া অন্য কোন কবরে নামকরণ করা নেই। নাম না জানা বিস্তৃত ডালপালার একটি সুন্দর গাছের নীচে শাহ ইসমাঈল শহীদের অনাড়ম্বর কবরটি। পাশের দেয়ালে লম্বা পরিচিতি ফলক লাগানো। কবরের দু'ধারে হালকা করে পাথর দিয়ে বাঁধানো থাকলেও উপরাংশ খোলা। কবরপূজারীরা এমন একজন মহান মানুষের কবরকে কমপক্ষে মাযার বানানোর হাত থেকে রেহাই দিয়েছে– এটাই অনেক বড় কথা। কবরের নিকটবর্তী হতে শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল। প্রাতঃস্মরণীয় একজন মহামনীষীর এত নিকটতম সান্নিধ্যে এসে নিজেকে অপ্রস্তুত মনে হয়। একটা আবেগঘন মুহূর্ত। অশ্রুর উত্তাপে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রায় দু'শ বছর পূর্বে গত হওয়া এই মহান বীর মুজাহিদ, বিপ্লবী আলেমে দ্বীনের কবরটা হঠাৎই মনে হয় জীবন্ত। যেন জিহাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে এখনই কোন দিকনির্দেশনা দেবেন, যে নির্দেশ পালনে স্নায়ুতন্ত্র আপনা আপনিই প্রস্তুত হয়ে যায়। কবর যিয়ারত শেষে আনমনে আওড়ালাম, হে মহান বীর! আপনাদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। শিরক ও বিদ'আতবিরোধী যে মহান আন্দোলন আপনারা শুরু করেছিলেন, বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে রুখে দাঁড়ানোর যে পথ আপনারা দেখিয়েছিলেন, তা কেবল উপমহাদেশেই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই হকপন্থী মুসলমানদের আন্দোলনকে বেগবান করেছে। কিছুক্ষণ থাকার পর ধীরপায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। কেমন যেন একটা অপরাধবোধ চেপে বসতে থাকে, তাঁদের ইলমী ও জিহাদী উত্তরাধিকার যথার্থভাবে বহন করতে না পারার।

ফিরতি পথে মটরসাইকেলে যেতে যেতেই যাহেদ ভাই যথাসম্ভব যুদ্ধের স্থানগুলো দেখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। আসার সময় অবশ্য 'তাওহীদের ডাক'-এ প্রকাশিত শিহাবুদ্দীন আহমাদ ভাইয়ের বালাকোট যুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গের লেখাটি পড়ে এসেছিলাম, যেন যুদ্ধক্ষেত্রটি চিনতে সুবিধা হয়। প্রায় দু'শো বছর আগের ভূমিগঠন কতদূর

অবিকৃত আছে আল্লাহ মা'লূম, তবে বর্ণনার সাথে প্রায়ই মিলে গেল। পরিবেশটা দেখে কেবলই মনে হতে লাগল, এত বড় বড় পাহাড়, টিলা, পাথুরে খাড়ি আর দুর্গম পথ অতিক্রম করে কিভাবে তাঁরা এসব এলাকায় জিহাদ করেছিলেন!

বালাকোট বাযারে আবার ফিরে আসলাম। সেখান থেকে কাঁচাবাজারের একটু ভিতরে কুনহার নদীর নিকটেই সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (র.)-এর কবর। কবরস্থানের গা ঘেঁষে জামে মসজিদ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (র.)। প্রাচীরঘেরা কবরস্থানটি খুব বেশী জায়গা নিয়ে নয়। সেখানে অনেকগুলো কবরের মাঝে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের কবরটি সবুজ রঙ করে বেশ উঁচু করে বাঁধানো। তেমন কোন আড়ম্বর নেই। স্রেফ একটি ফলকে তাঁর নাম-পরিচয় উর্দূতে লেখা। এই কবরটিকেও মাযারাকৃতি দেয়া হয়নি আল-হামদুলিল্লাহ। তবে ব্রেলভীদের প্রথা মোতাবেক আর সব কবরের মত হালকা জরির মালা জড়ানো আছে। যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর তাঁর দ্বি-খণ্ডিত শরীর প্রথমে কুনহার নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে কারো মতে তাঁর মস্তকটি এখানে দাফন করা হয়েছিল। কারো মতে, কয়েক মাইল ভাটিতে তাঁর লাশ ভেসে যায় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও শুরু থেকে এটিই তাঁর কবর হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

তাঁর কবরের পার্শ্বেই সাধারণ একটি কবর, যেখানে শুয়ে আছেন জিহাদ আন্দোলনের পরবর্তী এক মুজাহিদ মাওলানা ফযলে হক ওয়াযীরাবাদী। লাহোরের নিকটবর্তী ওয়াযীরাবাদের অধিবাসী এই আহলেহাদীছ মুজাহিদ নেতা গত শতাব্দীর ষাটের দশকে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে এখানে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের পার্শ্বে দাফন করার জন্য অছিয়ত করে যান। আসার সময় সাজ্জাদ দুররানী ভাই বলছিলেন উনার কবরটা অবশ্যই যিয়ারত করে আসতে। কারণ লোকজন অধিকাংশই উনার সম্পর্কে জানেনা, ফলে যিয়ারতও করে না।

কবর যিয়ারতের পর বাইরে বের হতেই মাগরিবের আযান দিল। ফিরে এসে মসজিদে মাগরিব পড়ার পর হাসপাতালে ছোট্ট অতিথিকক্ষে ঢুকলাম। জাহাযের পণ্যবাহী ৬টি কন্টেইনার একত্রিত করে হাসপাতালটি বানানো, যার মধ্যে রয়েছে একটি অপারেশন রুম, ল্যাব, কেবিন, অফিস, অতিথিকক্ষ আর কিচেন। অস্থায়ী হলেও মোটামুটি সাজানো-গোছানো। সন্ধ্যার পর স্থানীয় কিছু ভাই এসেছিলেন। ওনাদের সাথে কথাবার্তা ও নাশতা-পানি হ'ল। এশার ছালাতের পর সবাই একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলাম। বাযার থেকে আসার সময় কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন এনেছিলাম। সেটা বিলি করার জন্য অফিস পিয়ন নাদীম ভাইকে দিতেই সেকি রাগ। অতিথিকে কেবল অতিথি হিসাবেই দেখতে ইচ্ছুক তারা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, চিন্তার কারণ নেই, এটা কেবল একজন দ্বীনী ভাইয়ের পক্ষ থেকে উপহার মনে করুন, মেহমান হয়ে মেযবান সাজার কোন সাধ আমার নেই! খাওয়া-দাওয়া শেষে পরিচালক সাজ্জাদ ভাই থাকলেন আমার সাথে এবং তাদের কার্যক্রমের বিভিন্ন ভিডিও দেখালেন।

সন্ধ্যার পর শহরের কোলাহল থেমে এলে কুনহার নদীর গর্জনটা বেশ জোরেই কানে আসছিল। তাই এক ফাঁকে রাতের কুনহার নদী দেখতে গেলাম একাকীই। বাযারে এসে ব্রীজের উপর উঠতে সেকি বাতাস আর গর্জন। কানে তালা লাগার জোগাড়। অন্ধকার থেকে ভেসে আসা সেই তুমুল গর্জনের শব্দে আর ঝড়ো বাতাসে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। মনে হয় হঠাৎ উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। রেলিংটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। ভীতিকর অভিজ্ঞতা হলেও প্রকৃতির অকৃত্রিমতায় মিশে যাওয়া, অবিরাম ছুটে চলা স্রোতের দুর্বার বন্যতা নীরবে উপভোগ করার একটা দারুণ মওকা মিলল। আসার সময় কাউকে বলে আসিনি। তাই হাসপাতালে ঢোকার পর দেখি সাজ্জাদ ভাইরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন একাকী কোথায় গেলাম সেই চিন্তায়। চোর-দস্যুর ভয় না থাকলেও নিরাপত্তাবাহিনী নিয়ে শংকাটা কিছুটা কাজ করে সবার মধ্যেই। উনাদের আশ্বস্ত করে অতিথিকক্ষে ঢুকে দেখি ঘুমানোর সব আয়োজন করে রেখেছে নাদীম ভাই। একটু আগেভাগেই শুয়ে পড়তে হলো, অফিসসহ গোটা বালাকোট ঘুমিয়ে পড়ায়। রাত দশটা মানে যে এখানে গভীর রাত।

(চলবে)

হকের পথে যত বাধা

আমি নো'মান, ফরিদপুরের মুসলিম পাড়ায় আমার বাড়ী। আমি শুরু থেকেই ইলিয়াসী তাবলীগে সময় ব্যয় করতাম। প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের সাথে চিল্লা দিয়ে আর গাশত করে জীবনের অনেকটা সময় পার করেছি। এটাকেই দ্বীনের খেদমত, মুসলিম উম্মাহ্র সেবা এবং ইসলামের কল্যাণ জ্ঞান করতাম। হঠাৎ একদিন একটি ওয়ায মাহফিল থেকে একটি মাসনূন দো'আ ও ছালাত শিক্ষা বই ক্রয় করলাম এবং পড়তে শুরু করলাম। এ বই পড়ে আমার সব কিছু যেন উলট-পালট হয়ে গেল। এতদিন যা করছি তাকি সবই তাহ'লে ভুল? আমার মনে তখন অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পর মারকায মসজিদে গেলাম এবং দ্বীন বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম মুফতী কামারুযযামান ছাহেবকে। মুফতী ছাহেব উত্তর দিলেন মাযহাবের অনুকূলে। উত্তর পেয়ে খুশি হ'তে পারলাম না। এভাবেই চলল বেশ কিছু দিন। হঠাৎ একদিন এক ভাই সংবাদ দিলেন এক মাদানী ছাহেব আসবেন। বেশ তৈরী হয়ে থাকলাম। গেলাম আলোচনা শুনতে। আলোচনা শুনলাম, কিছু প্রশ্নও করলাম, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর পেলাম। শুরু করলাম ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করতে। শুরু হ'ল আমার মহল্লার তাবলীগী ভাইদের মধ্যে আমাকে নিয়ে আলোচনা। একদিন এক সাথী ভাই আমাকে বলল, তুমি এভাবে ছালাত আদায় করছ কেন? আমাদের মাযহাব হানাফী, তুমি কি হানাফী মাযহাব মানো না? তখন আমি বললাম, আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ছাড়া কোন কিছুই মানি না। তখন আমাকে তারা বলল, কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে, যার বলে তুমি এই নতুন আমল করছ? আমি বললাম, আমার কাছে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি আছে। তারা বলল, এই বই পড়া তোমার জন্য ঠিক নয়। এই বই পড়লে তুমি গোমরাহ হয়ে যাবে। এভাবেই তাদের সাথে আমার কথাবার্তা শেষ হ'ল। এ ঘটনা ঘটার ১১ দিন পর রামাযান মাস আসল। এবার তারাবীর ছালাত পড়াতে আসা হাফেয ছাহেবের সাথে বিবাদ শুরু হ'ল আমীন বলা নিয়ে। এক পর্যায়ে মসজিদের সেক্রেটারী আমাকে মারার জন্য কিছু যুবককে ঠিক করল। একদিন তারা আমাকে মারতে আসল। কিন্তু তারা আমাকে মারল না। তবে বলে দিল, এই মসজিদে তোমার আসা নিষেধ। কিন্তু আমি মসজিদ ছাড়তে রাযী হ'লাম না। একটা সময় আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল মনে হ'ল। কিন্তু না, আবার কিছু দিন পর মুওয়াযিযন না থাকায় ইকামত দিতে হ'ল আমাকে। মাঝপথে তারা আমার ইকামত দেওয়া বন্ধ করে দিতে চাইল। আমি বাধা না শুনে ইকামত দিতেই লাগলাম। ইমাম ছাহেব বললেন, এই ইকামত আমাদের দেশে চলবে না। আমি বললাম, তাহ'লে কোন দেশে চলবে? উত্তর দিলেন সঊদী আরবে চলে, বাংলাদেশে চলে না। আমি বললাম, সঊদী আরবের ইসলাম ও বাংলাদেশের ইসলাম কি আলাদা? ইমাম ছাহেব বললেন, এই মসজিদে ইকামতের শব্দ একবার বলা চলবে না। আমাদের মাযহাবের আমলই ঠিক। অবশেষে আমার ইকামত দেওয়া বন্ধ করে দিল মসজিদ কমিটি।

উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা, ইকামতের শব্দ, ৮ রাক'আত তারাবীর ছালাত ইত্যাদি নিয়ে আমাকে মারার জন্য কয়েক দফা লোক ঠিক করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে তারা আমাকে মারতে পারেনি। অবশেষে গত ১৬/০৫/১৪ইং রাতে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী আমাকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি তাকে বার বার কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পড়তে আগ্রহী করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার একই কথা, সারা দুনিয়ার হুজুররা কি ভুল করে? আমি বললাম, শরী'আতের হুকুম চলবে আল্লাহ ও নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কোন মানুষের কথায় নয়। তখন আমার উপর তিনি রেগে গেলেন। কথা শেষ করে চলে আসলাম।

তার একদিন পর ১৭/০৫/১৪ তারিখে জনৈক্য মাওলানা আসলেন মসজিদে বয়স্ক লোকদেরকে নূরানী কায়দায় কুরআন শিক্ষা দিতে। আমি ভাবলাম, এই সুযোগে শুদ্ধভাবে কুরআন পড়া শিখতে পারব ইনশাআল্লাহ। মাওলানা ছাহেব ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, ৮০ বছরের গুনাহগার ১ ব্যক্তি ভাবলেন আমাকে কুরআন শিখতে হবে। তখন তিনি ইমামের কাছে গিয়ে আলিফ, বা, তা, ছা পড়া নিয়ে বাড়ীতে ফিরলেন। পরে তিনি মারা গেলেন। দাফন-কাফন সম্পন্ন হ'ল। কবরের ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করলে উত্তর দিলেন, আলিফ, বা, তা, ছা। এতে ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র দরবারে গিয়ে বললেন, কবরের ব্যক্তি উত্তর দিচ্ছে আলিফ, বা, তা, ছা। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করল। আমি তখন মাওলানা ছাহেবকে বললাম, এই ঘটনাটা কি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, নাকি ছহীহ হাদীছে? তিনি উত্তর দিলেন, দলীল আছে, পরে আপনাকে জানাব। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। দুই দিন পরে কুরআন শিক্ষার ক্লাস শুরু হ'ল, আমিও ক্লাসে উপস্থিত হ'লাম। হঠাৎ তিনি কুরআন জোরে জোরে পড়তে উৎসাহিত করলেন এই বলে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ডান পাশ থেকে বাম পাশের স্তনের দুই ইঞ্চি নিচে কলবে ধাক্কা দিলে গুনাহের ময়লা পরিষ্কার হয়। এ কথারও দলীল জানতে চাইলাম। মাওলানা ছাহেব বললেন, আগামী কাল সব জানাব। আমি মসজিদ থেকে বাসায় চলে আসলাম। এরই মধ্যে মাওলানা ছাহেব সেক্রেটারী ছাহেবকে সব জানালেন। সেক্রেটারী আমার বাসায় এসে আমাকে ডেকে বললেন, আপনি মাওলানা ছাহেবকে কি বলেছেন? আমি বললাম, মাওলানা ছাহেবকে এই এই কথা বলেছি। তিনি আমাকে বললেন, কাজটা ভাল করেননি। ফজরের ছালাতে মসজিদে আসবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে আসবো ইনশাআল্লাহ। যথারীতি ফজরের ছালাতের জামা'আতে শরীক হ'লাম। সালাম ফিরানোর পর সেক্রেটারী ঘোষণা দিলেন সবাই বসবেন, কথা আছে। তখন সেক্রেটারী আমার নিকটে এসে চোখের সামনে আঙ্গুল এনে বললেন, তুই মাওলানা ছাহেবকে প্রশ্ন করলি কেন? তুই প্রশ্ন করার কে? তুই এখানে থাকিস ভাড়া বাড়ীতে, তুই প্রশ্ন করার কে? আমি বললাম, দ্বীনের বিষয়ে জানার জন্য আমি তাকে প্রশ্ন করতে পারি। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ– 'তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর, স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহ' *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*। তখন তারা সবাই আরো রেগে গেল এবং আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দিল। তখন থেকে অদ্যাবধি আমি বাড়ীতেই ছালাত আদায় করছি। আমার এ জীবনে আমি দেখেছি, হক কবুল করা ও তা মেনে চলা অতীব কঠিন। এক্ষেত্রে সমাজের মানুষই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও আমি হকের উপরে অটল থাকার চেষ্টা করছি। সেই সাথে আমি মহান আল্লাহ্র কাছে এই দো'আ করি যে, আল্লাহ যেন আমার এলাকার সকল মানুষকে হেদায়াত দান করেন-আমীন!

-মুহাম্মাদ নো'মান
মুসলিমপাড়া, গুহলক্ষীপুর, ফরিদপুর।

হাদীছের গল্প

নেতা কর্তৃক কর্মীর পরিচর্যা

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা যদি আগামীকাল পানি না পাও তাহ'লে তোমার পিপাসার্ত হবে। তখন ত্বরাপ্রাবণ কিছু লোক পানির খোঁজে রওয়ানা হ'ল। আর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকাকে আবশ্যক করে নিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর বাহন তাঁকে নিয়ে ঝুঁকে পড়ছিল আর তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে ঠেকা দিলাম, তিনি আমার উপর হেলান দিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি ঢলে পড়লেন, আমি তাঁকে ঠেস দিলাম। তিনি আমার উপর হেলান দিলেন। আবার তিনি এতটাই হেলে পড়লেন যেন সওয়ারী থেকে পড়ে যাবেন। আমি তাঁকে ঠেকা দিয়ে সতর্ক করলাম। এবার তিনি জেগে উঠে বললেন, লোকটি কে? আমি বললাম, আবু ক্বাতাদা। তিনি বললেন, কতক্ষণ ধরে তোমার এমন পথ চলা হচ্ছে? আমি বললাম, আজ সারা রাত ধরে। তিনি বললেন, তুমি যেমন আল্লাহ্‌র রাসূলকে হেফাযত করলে আল্লাহও যেন তেমনি তোমাকে হেফাযত করেন। তারপর তিনি বললেন, শেষ রাতে আমরা যদি একটু ঘুমিয়ে নিতাম! অতঃপর তিনি একটা গাছের নিকট গিয়ে সেখানে বাহন থেকে অবতরণ করে আমাকে বললেন, লক্ষ কর কাউকে দেখতে পাও না কি? আমি বললাম, এই একজন আরোহী, এই দুইজন আরোহী, এভাবে সাতজন পর্যন্ত হ'ল। তিনি বললেন, তোমরা আমাদের ছালাত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকবে। তারপর আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু সকালের সূর্যের তাপ ব্যতীত আর কিছুই আমাদেরকে জাগ্রত করেনি। আমরা জেগে উঠলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহন করলেন এবং কিছু দূর পথ চললেন। আমরাও তাঁর সাথে কিছু দূর গেলাম। তারপর তিনি বাহন থেকে নেমে বললেন, তোমাদের কাছে কি পানি আছে? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ, আমার কাছে একটা পানির পাত্র আছে, তাতে সামান্য পানি আছে। তিনি বললেন, ওটা নিয়ে এসো। আমি তাঁর নিকট সেটা নিয়ে এলাম। তিনি সবাইকে বললেন, তোমরা এটা থেকে ওযূ কর, তোমরা এটা থেকে ওযূ কর। লোকেরা সকলে ওযূ করল। পাত্রে এক ঢোক পানি থেকে গেল। তিনি বললেন, আবু ক্বাতাদা, এই এক ঢোক পানি সংরক্ষণ কর। অচিরেই এর জন্য একটা ঘটনা ঘটবে। তারপর বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। তারা ফজরের আগের দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর ফজর ছালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সওয়ারীতে চড়ে বসলেন, আমরাও সওয়ার হলাম। এ সময় তাদের কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমরা আমাদের ছালাতে গাফলতি করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কথা শুনে বললেন, তোমরা কী বলাবলি করছ? যদি তোমাদের জাগতিক বিষয়ে কিছু বলাবলি কর তবে তোমরা তা করতে পার, আর যদি তোমাদের দ্বীনী কোন বিষয় হয় তাহ'লে আমার কাছে বল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ), আমরা আমাদের ছালাতের বিষয়ে অবহেলা করে ফেলেছি। তিনি তখন বললেন, ঘুমের মধ্যে কোন অবহেলা নেই, অবহেলা জাগ্রত অবস্থায়। যদি এমন কিছু ঘটে যায় তবে তোমরা তখনই (ঘুম থেকে জেগেই) ছালাত পড়ে নেবে। আর আগামী দিন যথাসময়ে পড়বে। তারপর তিনি বললেন, লোকজনের খবর কিছু আঁচ করতে পারছ কী? তারা বলল, আপনি গতকাল বলেছিলেন, তোমরা আগামীকাল পানি না পেলে তোমাদের পিপাসার্ত হ'তে হবে- তাই লোকেরা পানির খোঁজে গেছে। তিনি তখন বললেন, ঐ লোকেরা তাদের নবীকে হারিয়ে ভোর করেছে। এ দিকে তারা বলাবলি করতে লাগল যে, নিশ্চয়ই নবী করীম (ছাঃ) পানির কাছে রয়েছেন।

দলের মধ্যে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। তাঁরা বললেন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের পেছনে রেখে নিজে আগেভাগে পানির ধারে পৌঁছে যাওয়ার মানুষ নন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন বার বললেন, লোকেরা যদি আবুবকর ও ওমরকে অনুসরণ করত তাহ'লে তারা সঠিক দিশা পেত।

তারপর যখন দুপুরের তাপ তেতে উঠল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উচ্চকণ্ঠে তাদের অবস্থা সমদ্ধে জানতে চাইলেন। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পিপাসায় আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম, আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমাদের উপর কোন ধ্বংস নেমে আসবে না। তারপর তিনি বললেন, আবু ক্বাতাদা! পানির পাত্রটা নিয়ে এসো। আমি তা নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, আমার জন্য আমার পাত্রটা খুলে দাও (অর্থাৎ তিনি তাঁর পানিশূন্য পাত্রের কথা বলছিলেন)। আমি সেটার মুখ খুলে তাঁকে দিলাম। তিনি তখন তাতে পানি ঢালতে লাগলেন, আর লোকেরা তা পান করতে লাগল। পানির নিকট লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে লোকেরা! তোমরা সুশৃঙ্খলভাবে পানি গ্রহণ কর। তোমাদের সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে যেতে পারবে। দলের সকল লোক পানি পান করল। শেষ পর্যন্ত আমি আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাড়া আর কেউ বাকী থাকল না। তিনি আমার জন্য পানি ঢেলে দিয়ে বললেন, আবু ক্বাতাদা! পানি পান কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি পান করুন। তিনি বললেন, লোকদের পানি পরিবেশনকারী সবার শেষে পান করে। ফলে আমি পান করলাম, তারপর তিনি পান করলেন। পানির পাত্রে পানি আগে যেটুকু ছিল ততটুকুই থেকে গেল। এদিন তারা ছিল তিন শত জন *(মুসলিম হা/৬৮১, আহমাদ হা/২২৫৯৯, মিশকাত হা/৫৯১১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২২৫)*।

-আব্দুর রহীম
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগৎ

(১) আদার রসের উপকারিতা

১. আদার রস খেলে আহারে রুচি আসে এবং ক্ষুধা বাড়ে।
২. আদার রসে মধু মিশিয়ে খেলে কাশি সারে।
৩. আদা মল পরিষ্কার করে।
৪. আদার রসে পেটব্যথা কমে।
৫. আদা পাকস্থলী ও লিভারের শক্তি বাড়ায়।
৬. আদা স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।
৭. আদার রস শরীর শীতল করে।
৮. আদা রক্তশূন্যতা দূর করে।

(২) ডায়াবেটিস চেনার উপায়

১. গলা শুকিয়ে যাওয়া, বারবার পানির পিপাসা, পানি খেলেও পিপাসা না মেটা।
২. বারবার ক্ষুধা লাগা। কোন কারণ ছাড়াই ওযন কমে যাওয়া।
৩. চোখে দেখতে অসুবিধা।
৪. শরীরের কোথাও কেটে গেলে কিংবা আঘাত পেলে তা দ্রুত সারে না।
৫. মেয়েদের মাসিকের সমস্যা দেখা দেওয়া।
৬. বারবার টয়লেটে যাওয়ার প্রবণতা।
৭. ওযন অতিরিক্ত বেড়ে গেলেও ডায়াবেটিস হ'তে পারে।
৮. ৩৫ বছর বয়স থেকেই নিয়মিত ডায়াবেটিসের চেকআপ করা যরূরী।
৯. ডায়াবেটিস আছে কি-না তা জানার জন্য ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট যরূরী। এছাড়া ব্লাড সুগার পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা দ্বারাও জানা যাবে ডায়াবেটিস হয়েছে কি-না।

(৩) ক্যান্সারমুক্ত জীবনের জন্য ৯টি অভ্যাস

১. অধিক হারে টাটকা শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস করা।
২. অধিক আঁশজাতীয় খাবার গ্রহণ করা।
৩. ভিটামিন 'এ' জাতীয় খাবার বেশি গ্রহণ করা।
৪. ভিটামিন 'সি' জাতীয় খাবার অধিক গ্রহণ করা।
৫. শরীরের ওযন নিয়ন্ত্রণ করা।
৬. উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৭. ধূমপান থেকে বিরত থাকা।
৮. পান, জর্দা, তামাক সেবন বন্ধ করা।
৯. আচার, কাসন্দ, শুঁটকি এবং লবণ দেয়া মাছ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

(৪) ক্যান্সার প্রতিরোধে পালং শাক

শাক-সবজি খাওয়ার কথা শুনলেই বাচ্চাদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির মতো অবস্থা হয়। অন্যদিকে পালং পনির বা পালংয়ের স্যুপ খাই আমরা সবাই। তবে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন পালং শাক খাওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন।

পালং শাকের খাদ্যগুণ :

প্রতি ১০০ গ্রাম পালংশাকে কার্বোহাড্রেট থাকে প্রায় ৩.৬ গ্রাম, প্রোটিন থাকে ১.৫ গ্রাম, ফ্যাট থাকে ০.১ থেকে ১.০ গ্রাম। এছাড়া ভিটামিন-A, ভিটামিন-B, ভিটামিন-C, ভিটামিন-E, ভিটামিন-K রয়েছে। ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, প্যাটি অ্যাসিডও থাকে।

উপকারিতা :

পালং শাক পেট পরিষ্কার রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া পালং শাক রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে, দৃষ্টিশক্তিও বাড়ায়। ক্যানসার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক হিসাবে পালং শাক অপরিহার্য। পালং শাকের রস দিয়ে গারগেল করলে গলা জ্বালা কমে যায়। হার্টের অসুখেও যথেষ্ট উপকারী। কিডনিতে পাথর থাকলে, তা গুঁড়ো করতে সাহায্য করে। দেহ ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ রাখতে পালং শাক অতি প্রয়োজনীয়। অনেকের মেদ বৃদ্ধি ও দুর্বলতায় হাফ ধরে, তাদের পালং পাতার রস খেলে উপকার হয়। পালং শাক কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কাঁকড়া বিছে, বোলতা, মৌমাছি, ভোমরা ও বিষাক্ত পোকা হুল ফোটালে বা কামড় দিলে পালং শাকের শেকড় বেটে প্রলেপ দিলে ফোলা ও যন্ত্রণা কমে যায়। ডায়াবেটিক রোগীদের পালং শাক খাওয়া দরকার। তবে যাদের ইউরিক অ্যাসিড আছে, তাদের জন্য পালং শাক খাওয়া একদমই উচিত নয়।

(৫) মেদ কমাতে কাঁচা পেপে

পেঁপের রয়েছে নানা গুণ। মেদ সমস্যায় কাঁচা পেঁপে সালাদ হিসাবে খেলে উপকার পাওয়া যায়। পেটের গোলমালে পেঁপে খেলে উপকার হয়। অন্যান্য ফলের তুলনায় পেঁপেতে ক্যারোটিন অনেক বেশি থাকে। কিন্তু ক্যালরির পরিমাণ বেশ কম থাকায় মেদ সমস্যায় পেঁপে খেলে ফল পাওয়া যায়। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' আছে।

সালাদে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টমেটো, শসা, গাজর, কাঁচামরিচ, পিঁয়াজ, লেটুসপাতা স্থান পায়। এসব সবজির মিশ্রণে তৈরী সালাদে ভিটামিন 'সি', ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'ই'র পরিমাণ থাকায় এ ধরনের সালাদ এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। তবে সালাদে কাঁচা পেঁপে মেশানো হ'লে তা আরও উপকারী হয়। কারণ পেঁপেতে থাকে প্রচুর পরিমাণ পেপসিন। এই পেপসিন হজমে সাহায্য করে। কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে পেপেইন নামক হজমকারী দ্রব্য থাকে। যা অজীর্ণ, কৃমি সংক্রমণ, আলসার, ত্বকে ঘা, কিডনি ও ক্যান্সার নিরাময়ে কাজ করে। কাঁচা পেঁপের কষ বাতাসার সঙ্গে খেলে লিভার সংক্রান্ত নানা সমস্যা দূর হয়। এর সঙ্গে ক্ষুধা বাড়ে এবং জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে। অপরদিকে পেঁপের রসে এমন কিছু উপাদান আছে যা আমাশয়, অশ্ব, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সক্ষম। পেঁপে খেলে শরীর থেকে দূষিত বায়ু সহজেই বেরিয়ে যায়। কাঁচা পেঁপের তরকারি পথ্যের কাজ করে।

চিকিৎসকরা ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের কাঁচা পেঁপের তরকারি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অপরদিকে কাঁচা পেঁপের কষ ঘা শুকাতে সাহায্য করে। পাকা পেঁপে লিভারের জটিল সমস্যা দূর করে। পাচন শক্তি বাড়ায়। প্রতিদিন কাঁচা পেঁপের তরকারি বা পাকা পেঁপে খাওয়া শরীরের পক্ষে খুবই

উপকারী। পুষ্টিগুণের দিক দিয়ে পেঁপে অন্য ফলের তুলনায় অনেক বেশি পুষ্টিকর। পাকা পেঁপে ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। কাঁচা পেঁপেতেও ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'বি' এবং ভিটামিন 'সি' আছে। এছাড়া কাঁচা বা পাকা পেঁপেতে লৌহ ও ক্যালসিয়াম আছে। পেঁপে কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

পেঁপের ঔষধি গুণ সমূহ

রক্ত আমাশয় : প্রত্যেহ সকালে কাঁচা পেঁপের আঠা ৫/৭ ফোঁটা ৫/৬ টি বাতাসার সঙ্গে মিশিয়ে ২/৩ দিন খাওয়ার পর রক্তপড়া কমতে থাকবে।

ক্রিমি : যে কোন প্রকারের ক্রিমি হ'লে পেঁপের আঠা ১৫ ফোঁটা ও মধু ১চা চামচ একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। এরপর আধা ঘণ্টা পরে উষ্ণ পানি আধ কাপ খেয়ে তারপরে ১ চামচ বাখারি (শসা-ক্ষীরার মতো এর স্বাদ) চুনের পানি খেতে হয়। এভাবে ২ দিন খেলে ক্রিমির উপদ্রব কমে যাবে।

আমাশয় : আমাশয় ও পেটে যন্ত্রণা থাকলে কাঁচা পেঁপের আঠা ৩০ ফোঁটা ও ১ চামচ চুনের পানি মিশিয়ে তাতে একটু দুধ দিয়ে খেতে হবে। একবার খেলেই পেটের যন্ত্রণা এবং আমাশয় কমে যাবে।

যকৃত বৃদ্ধিতে : এই অবস্থায় ৩০ ফোঁটা পেঁপের আঠাতে এক চামচ চিনি মিশিয়ে এক কাপ পানিতে ভালো করে নেড়ে মিশ্রণটি সারাদিনে ৩ বার খেতে হবে। ৪/৫ দিন পর থেকে যকৃতের বৃদ্ধিটা কমতে থাকবে। তবে ৫/৬ দিন খাওয়ার পর সপ্তাহে ২ দিন খাওয়াই ভালো। এভাবে ১ মাস খেলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ক্ষুধা ও হজম শক্তিতে : প্রত্যেক দিন সকালে ২/৩ ফোঁটা পেঁপের আঠা পানিতে মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা ক্ষুধাও বেড়ে যাবে এবং হজমও ঠিকভাবে হবে।

পেট ফাঁপায় : কয়েক টুকরো পাকা পেঁপের শাঁষ, সামান্য লবণ এবং একটু গোলমরিচের গুড়া এক সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা পেট ফাঁপার উপশম হয়।

প্রবল জ্বরে : দেড় চামচ পেঁপে পাতার রস এক কাপ পানিতে মিশিয়ে খেতে হবে। এতে জ্বরের বেগ, বমি, মাথার যন্ত্রণা, শরীরে দাহ কমে যাবে। জ্বর কমে গেলে আর খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

মাসিক ঋতু বন্ধে : যাদের মাসিক ঋতু বন্ধ হওয়ার সময় হয়নি অথচ বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা যেটুকু হয় তা না হওয়ারই মত, সেক্ষেত্রে ৫/৬ টি পাকা পেঁপের বিচি গুড়া করে রোজ সকালে ও বিকালে দু'বার পানিসহ খেতে হবে। এর ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই মাসিক স্রাব ঠিক হয়ে যাবে। তবে অন্য কোন কারণে এটা বন্ধ হয়ে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

দাদে : যে কোন প্রকারের দাদ হোক না কেন, কাঁচা পেঁপের/গাছের আঠা ঐ দাদে লাগিয়ে দিতে হবে। একদিন লাগিয়ে পরের দিন লাগাতে হবে না, এরপরের দিন আবার লাগাতে হবে। এইভাবে ৩/৪ দিন লাগালে দাদ মিলিয়ে যাবে।

একজিমায় : যে একজিমা শুকনা অথবা রস গড়ায় না, সেখানে ১ দিন অথবা ২ দিন অন্তর পেঁপের আঠা লাগালে ওটার চামড়া উঠতে উঠতে পাতলা হয়ে যায়।

উকুন হ'লে : ১ চামচ পেঁপের আঠা, এর সঙ্গে ৭/৮ চামচ পানি মিশিয়ে ফেটিয়ে নিতে হয়। তারপর ঐ পানি চুলের গোড়ায় লাগিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর মাথা ধুয়ে ফেলতে হয়। এইভাবে একদিন অন্তর একদিন বা ২ দিন লাগালে উকুন মরে যায়।

(৬) সম্পূর্ণ ফ্যাটমুক্ত দেশি ফল সফেদা

সফেদা একটি দেশি মৌসুমি ফল। এ ফলের রয়েছে অসংখ্য ঔষধি গুণ। এটি সম্পূর্ণ ফ্যাটমুক্ত একটি মিষ্টি ফল।

সফেদার ঔষধি গুণ : সফেদায় আছে ফাইবার, পলিফেনলিক যৌগ ও ভিটামিন সি- যা আমাদের দেহকে নীরোগ রাখতে সহায়তা করে। সফেদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ফসফরাস, যা হাড়ের গঠন মযবূত করে। সফেদা কনজেশন এবং কাশি উপশম করতে সাহায্য করে।

সফেদার অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান প্রদাহজনিত সমস্যা সমাধান করে। অর্থাৎ গ্যাসট্রিটিস ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। সফেদায় বিদ্যমান ভিটামিন-এ, চোখের সুরক্ষায় কাজ করে। রাতকানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায়। ওযন কমাতে সাহায্য করে। সফেদা নিয়মিত খেলে স্থুলতাজনিত সমস্যার সমাধান হয়। সফেদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ, যা দেহে শক্তি প্রদান করে।

শুধুমাত্র সফেদা ফলে নয়। সফেদা গাছের পাতারও ঔষধি গুণ রয়েছে। সফেদা গাছের পাতা ছেঁচে সদ্য ক্ষত হওয়া স্থানে দিলে দ্রুত রক্তপাত বন্ধ হয়। সফেদা ডায়রিয়াবিরোধী উপাদান হিসাবে কাজ করে ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

সফেদা ফলে স্নায়ু শান্ত এবং মানসিক চাপ উপশম করার ক্ষমতা রয়েছে। ডাক্তাররা অনেকেই অনিদ্রা, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিকে সফেদা ফল খেতে উপদেশ দেন। এতে অনিদ্রা, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সেল ড্যামেজ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগার সমস্যা কমায়। ত্বকে বয়সের ছাপ দূর করে। ফুসফুস ভালো রাখে। সফেদার বীজের নির্যাস কিডনি রোগ সারাতে সাহায্য করে। সফেদা হজমে সাহায্য করে। অর্ধেক পাকা সফেদার পানি ফুটিয়ে কষ বের করে ব্যবহারে ডায়রিয়া ভালো হয়।

সফেদার পুষ্টি গুণ : ১০০ গ্রাম সফেদায় আছে ৮৩ গ্রাম ক্যালরি, ৩.৯ গ্রাম মিনারেল, ৫.৬ গ্রাম ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট এবং ১৪.৭ গ্রাম ভিটামিন।

উল্লেখ্য, সফেদা গাছের ছাল ও পাতা সমান উপকারী।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

(১) সিতা লাউ

সিতা লাউ চাষের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট মৌসুম নেই। একবার রোপণের পর ১০ বছর পর্যন্ত একই লতা থেকে বছরের ১২ মাস পাওয়া যাবে সবুজ লাউ। নতুন উদ্ভাবিত এই সবজির নাম সিতা লাউ। কাপ্তাই উপযেলার রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানীরা ১২ বছর গবেষণা করে এই নতুন জাতের সীতা লাউ উদ্ভাবন করেছেন।

কাপ্তাই রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হারুনুর রশীদ জানান, এই কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত সিতা লাউ একটি অতি উন্নত প্রজাতির সম্ভাবনাময় সবজি। চট্টগ্রামসহ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য এলাকায় স্বল্প পরিসরে এই সবজির চাষ হয়। লতানো গাছ এবং বেগুনের কাছাকাছি আকৃতির বলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য যেলায় উপজাতীয়রা এই সবজিকে 'লতা বেগুন' হিসাবে আখ্যায়িত করে। সিতা লাউয়ের দানাগুলি সুমিষ্ট এবং ফলের মত খাওয়া যায় বলে অনেক উপজাতীয় সম্প্রদায় এই ফলটিকে মিছির ফল হিসাবেও আখ্যা দিয়ে থাকে।

সিতা লাউ একটি দীর্ঘজীবী লতানো উদ্ভিদ। একবার একটি সিতা লাউয়ের লতা জন্মানোর পর এই লতা থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বছরের ১২ মাস লাউ উৎপাদন করা সম্ভব। লতা এবং লতা ছড়ানোর জন্য মাচাং-এর যত্ন নিলেই প্রায় প্রতিদিনই একটি লতা থেকে লাউ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। সিতা লাউ সবজি হিসাবে খুবই সুস্বাদু। সাধারণ লাউ-এর মত এই লাউ রান্না করা যায়। এছাড়া গরুর গোশতের সাথে এই লাউ রান্না করা হ'লে আরো বেশি সুস্বাদু হয়।

চারা লাগানোর ৫-৬ মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসে এবং ফুল ফোটার ২৫/৩০ দিনের মধ্যে ফলের ওযন ৪০০ থেকে ৮০০ গ্রাম হয়। মাঝে-মধ্যে ডালপালা ছাঁটাই করে দিলে নতুন শাখা-প্রশাখা বের হয়ে উৎপাদন বেড়ে যায়। একটি গাছ থেকে বছরে ২০০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। কচি অবস্থায় ত্বকসহ পুরো ফলটিই সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর স্বাদ অনেকটা চালকুমড়ার কাছাকাছি। তবে একটু মিষ্টি ভাব থাকে। আবার সিতা লাউ পূর্ণ পেকে গেলে এটি সুমিষ্ট রসালো হয়। সিতা লাউয়ের রস দিয়ে অতি চমৎকার শরবত তৈরী হয়। পাকা ফলে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে তা পেঁপে, আনারস বা কলার সাথে চমৎকার মিশ্র ফল ও ডের্জাট হিসাবে খাওয়া যায়।

(২) পেপে চাষে করণীয়

জাত : শাহী পেপে ,বাবু, সিনতা, রেড লেডি হাইব্রিড।

বীজের পরিমাণ : ১২-১৫ গ্রাম/প্রতি বিঘা।

চারা উৎপাদনের সময় :

কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে পৌষের মাঝামাঝি এবং মাঘের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

চারা উৎপাদন স্থান :

পলিথিন ব্যাগে চারা উৎপাদন করতে হয়। এজন্য ১৫×১০ সে.মি. আকারের পলিথিন ব্যাগে ২ ভাগ পচা গোবর+২ ভাগ মাটি+১ ভাগ বালি দ্বারা ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করতে হবে। বীজ বপনের আগে রিডোমিল স্প্রে করতে হয়। বীজ বপনের আগে হালকা রোদে বীজগুলি ২ ঘন্টা রেখে দিয়ে বপনের ২৪ ঘন্টা আগে পানিতে ভিজিয়ে, পানি ঝরিয়ে ভেজা কাপড়ে মুড়ে উষ্ণ স্থানে রাখতে হয়। ২-৩ ঘন্টা পর প্রতিটি পলি ব্যাগে টাটকা সংগৃহীত বীজ হ'লে ১টি করে আর পুরাতন হ'লে ২-৩টি বীজ (তবে খেয়াল রাখতে হবে বীজ যেন সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত হয়) বপন করে হালকা পানি দিয়ে ছায়াযুক্ত ও বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রাখতে হবে। ব্যাগে একের বেশি চারা রাখা উচিত নয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারার ১-২% ইউরিয়া স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভালো হয়। নিয়মিত হালকা পানি সেচ দিতে হবে।

মাদায় সার প্রয়োগ ও চারা রোপন পদ্ধতি

মাদায় চারা রোপণ :

পলিথিন ব্যাগে উৎপাদিত ৩০-৪০ দিন (৪-৬ ইঞ্চি উচ্চতা) বয়সের চারা জমিতে মাদা বা গর্ত করে রোপণ করতে হবে। মাদা তৈরির সময় এক মাদা থেকে অপর মাদার দূরত্ব রাখতে হবে ২ মিটার এবং মাদার আকার হবে দৈর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতায় প্রায় ৬০ সে.মি. ।

মাদায় সার প্রয়োগের ২-৩ সপ্তাহ পর প্রতি মাদায় ৩টি করে চারা ত্রিভুজাকারে রোপণ করতে হবে। দু'সারির মাঝামাঝি ৪৫ সে.মি নালার ব্যবস্থা রাখলে সেচ বা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হবে।

চারা লাগানোর ১ দিন পূর্বে হালকা পানি দিয়ে পরদিন জো অবস্থায় ভালভাবে কুপিয়ে রিডোমিল স্প্রে করতে হবে। চারা যাতে হেলে না পড়ে সে ব্যবস্থা করতে হবে। হালকা পানি দিতে হবে।

মাদায় প্রয়োগ

সারের নাম	পরিমাণ	সারের নাম	পরিমাণ
ভার্মি কম্পোষ্ট	২ কেজি	জিপসাম	২৫০ গ্রাম
পচা গোবর সার	৬ কেজি	বোরণ	৩০ গ্রাম
সরিষার খৈল	৫০ গ্রাম	জিংক সালফেট বা দস্তা সার	২০ গ্রাম
টি.এস.পি	৪০০ গ্রাম		

উপরি সার প্রয়োগ

গাছে নতুন পাতা আসলে

	১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
এম.ও.পি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম

গাছে ফুল আসলে

	১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
এম.ও.পি	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

পেঁপে গাছ পুরুষ, স্ত্রী কিংবা উভয় লিঙ্গের মিশ্রণ হতে পারে। প্রতি মাদায় ৩টি করে পেঁপের চারা ত্রিভুজাকারে করে রোপণ করতে হয়। পরে গাছে ফুল আসলে প্রতি মাদায় একটি করে স্ত্রী অথবা উভয় লিঙ্গ গাছ রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। পরাগায়ণের জন্য প্রতি ১০-১৫টি স্ত্রী গাছের জন্য একটি পুরুষ গাছ রাখতে হবে।

বেশি করে পেঁপে ফলানোর জন্য অনেক সময় কৃত্রিম পরাগায়ণ দরকার হয়। সকাল বেলায় সদ্য ফোটা পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে এর পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে পুংকেশর স্ত্রী ফুলের গর্ভ কেশরের উপর ধীরে ধীরে ২-৩ বার ছোঁয়ালে পরাগায়ণ হবে। এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৫-৬টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ণ করা যেতে পারে।

পেঁপে গাছ ঝরে পড়ে যেতে পারে অথবা বেশি পরিমাণে ফল ধরলে কাত হয়ে যেতে পারে কিংবা ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই গাছকে রক্ষা করার জন্য বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাণ্ডের সাথে বেঁধে দেয়া দরকার।

শীতকালে প্রতি ১০-১২ দিন এবং গ্রীষ্মকালে ৬-৮ দিন অন্তর পেঁপের জমিতে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেচের অতিরিক্ত পানি যাতে নালা দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পেঁপে বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। *[সংকলিত]*

কবিতা

ঈদ উৎসব

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আজকে খুশীর বসল মেলা
ঈদগাহের ঐ ময়দানে।
সাজলো নতুন ভূষণে সব
লাগলো দোলা সব মনে।
ছিয়াম সাধনা শেষ হ'লে পর
আসলো দ্বারে ঈদের দিন,
নাইতো কারো দুঃখ-ব্যথা
সবটা মনে খুশীর দিন।
ঈদের খুশী সবার তরে
সমানভাবে বণ্টনে?
ছিয়াম সাধনায় নিঃস্ব-গরীব
নিচ্ছে তারা কোন মনে?
যার পরিধানে ছিন্ন কাপড়
তৈল বিহীন মাথায় চুল,
নাই পাদুকা চরণ দু'টোয়
সব নিরাশা শূন্য কূল।
বাচ্চাগুলোর পোষাক দিতে
পড়ছে যারা লজ্জাতে,
নাই টাকা তাই উপোষ থেকে
যাচ্ছে যারা ঈদগাহতে।
হাত পাতে যে অন্য দ্বারে
অল্প কিছুর দরকারে,
ঈদের খুশীর দিনটি তারা
কেমনভাবে পার করে?
তাদের তরে হয় না কভু
ঈদের খুশীর ফুর্তিটা,
দুঃখ-ব্যথা সবটি দিনে
তাদের সঠিক পাওনাটা।
রবের দ্বীনের বিজয় কেতন
উড়বে যে দিন এই ধরায়,
ঈদের খুশীর সুখ লহরী
ভরবে সে দিন পূর্ণতায়।

***

আবূ যর! আমার প্রিয় আবূ যর!

মুহাম্মাদ আহসান
সভাপতি
আহলেহাদীছ আন্দোলন, ঢাকা যেলা।

এই সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে তুমি সম্মুখে তাকাও
অসীম শূন্যতা তোমার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে তুলবে।
আবূ যর! আমার প্রিয় আবূ যর! তোমরা গাফিল হয়ো না,
পার্থিব জীবন ক্ষয়িষ্ণু এবং দ্রুত ফুরিয়ে যায়,
ধাবমান ঘোড়ার জিন শক্ত হাতে আঁকড়ে থেকো।
সমুদ্রগামী জাহাজের নির্ভুল নকশা, অভঙ্গুর কাঠামো
ইস্পাত দৃঢ় একটি জাহাজ তৈরী করো সত্বর, দেরি করো না।
তুমি সৈকতে দাঁড়িয়ে-উত্তাল সাগর সম্মুখে
গভীর তলদেশে অপার শূন্যতা এবং ভয়ংকর রুদ্রতা,
মনে রেখো অসীম সাগরে তোমাদের যিন্দেগানীর সফর।
ভুলে যেয়ো না আবূ যর! জীবন সফর পারাপার ভীষণ কঠিন।
সুদীর্ঘ এই সফরে নোঙর কর জাহাজ বন্দরে, সামান বোঝাই কর
বোঝা হালকা নাও, রসদ বোঝাই কর, দীর্ঘ তোমার পারাপার।
বক্ষে তোমার ইখলাছ সমুন্নত রেখো সারাক্ষণ আমলে
দৃষ্টি রয়েছে তোমার আমলনামায় প্রতিক্ষণ সর্বদ্রষ্টার।
সর্বজ্ঞানী নির্ভরতা তুমি ভুলে যেয়ো না একটি মুহূর্তও
আবূ যর! আমার প্রিয় আবু যর! তুমি প্রস্তুত?
এবার নোঙর তোল পাল উড়াও কামিয়াব হও সফরে।

***

ঈদের শিক্ষা

আলাউদ্দীন বিন আলীমুদ্দীন
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

শুধু ঈদের দিন হাসি-খুশী
ক্ষণিকের ভাল বাসা বাসি,
ছিয়াম রাখনি অতিভোজী মানুষ
অন্তরে অতি হিংসা রেষারেশি।
ছালাত-ছিয়াম ছাড়াই বেশি খুশী
রাজকীয় পোষাক দেহে অহংকারী হাসি,
অসহায় অনাথ খাদ্য-বস্ত্রহীন কাঁদে বসি
তবুও ধনীর আনন্দ রাশি রাশি।
মুখে তোমার মধু মাখা কথা
দীল-কলিজা ভরা হিংসা শঠতা,
একটু সুযোগ পেলেই দাও ব্যথা
তব মনে কেন এত শত্রুতা?
হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদ ভুলতে হবে
মুসলিমকে শুধু দু'ঈদের দিনে,
আর আমরণ অসহ্য যন্ত্রণা দেবে
কেন মানুষকে অকথ্য নির্যাতনে?
ঈদের দিনে যেমন হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে
ছালাত কায়েম করতে হবে সকলে,
সবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্ধুত্বের দীলে।
তেমনি আজীবন ভুলে বিভেদ অহংকার
মায়া-মমতা আর প্রীতির বন্ধনে,
গড়তে হবে তোমায় ব্যক্তি-পরিবার
আর এ সমাজ অহীর বিধানে।
ঈদের দিনের এই মহান শিক্ষা
মোরা জীবনে ভুলি না যেন কভু,
এই ফরিয়াদ কবুল কর
ওহে! বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের মহান প্রভু।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
২. আবু বকর (রাঃ)-কে।
৩. আবু তালহা (রাঃ)।
৪. খাদীজা (রাঃ)-কে।
৫. ফাতিমা (রাঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার (সমুদ্র সৈকত)-এর সঠিক উত্তর

১. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।
২. ১৫৫ কিলোমিটার।
৩. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে।
৪. পটুয়াখালী যেলায়।
৫. ১৮ কিলোমিটার।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনে কতবার 'দুনিয়া' শব্দটি এসেছে?
২. পবিত্র কুরআনে কতবার 'আখেরাত' শব্দটি এসেছে?
৩. পবিত্র কুরআনে কতটি অক্ষর রয়েছে?
৪. পবিত্র কুরআনে কতটি শব্দ আছে?
৫. পবিত্র কুরআনে কতবার 'রহমান' শব্দ এসেছে?
৬. পবিত্র কুরআনে কতবার 'জান্নাত' শব্দ এসেছে?
৭. পবিত্র কুরআনে কতবার 'জাহান্নাম' শব্দ এসেছে?
৮. পবিত্র কুরআনে কতবার 'নার বা আগুন' শব্দ এসেছে?
৯. পবিত্র কুরআনে কতবার 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' শব্দ এসেছে?
১০. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে আরবী ২৯টি অক্ষরই রয়েছে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

জামনগর, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২২ জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর জামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তারিকুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের ছাত্র আব্দুল হাফীয। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র মুহাম্মাদ রায়হান। অনুষ্ঠানে নাটোর যেলা ও জামনগর শাখা গঠন করা হয়।

বিদ'আত

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ধর্মে বিদ'আত কর্মে বিদ'আত
বিদ'আতের এই যামানা।
মানুষ আবার ভাগ করেছে
বিদ'আতে সাইয়েয়াহ ও হাসানা।
এই ভাগাভাগির কোন দলীল
কুরআন-হাদীছে কোথাও নাই,
ছিল না এসব রাসূলের যুগে
ছিল না ছাহাবীদের যামানায়।
বর্তমানে ধর্মের নামে
চালু আছে হরেক বিদ'আত,
মীলাদ-কিয়াম কুলখানী আর
ভাগ্যরজনী শবেবরাত।
এসবগুলোর শেষ পরিণতি
ভ্রষ্টতা আর গোমরাহী,
না ছাড়লে বিদ'আত এ জীবনে
পরকালে হবে ভীষণ দুর্গতি।
সময় থাকতে ছাড় বিদ'আত
আমল কর কিতাব-সুন্নাতের,
তবেই পাইবে নাজাত
পাবে ঠিকানা জান্নাতের।

বিপুল সৃষ্টি

সুমাইয়া
মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সৃজন করেছ আকাশ-যমীন
সৃজন করেছ রবি,
যমীনের মাঝে অপরূপ সাজে
এঁকেছ কত ছবি!
সৃজন করেছ চন্দ্র-সূর্য
সৃজন করেছ বিহঙ্গ,
তটিনীর মাঝে বইয়ে দিয়েছ
রূপের অপূর্ব তরঙ্গ।
অদ্রি-গিরি সৃজন করেছ
দিয়েছ কত শোভা,
মনোহর রূপে জগতের মাঝে
দান করেছ প্রভা।
বসন্তদূত সুমধুর কণ্ঠে
গায় যে তোমার গান,
অরণ্যের মাঝে শুনতে পাই
হরেক পাখির কলতান।
সৃষ্টি তোমার অতি মনোহর
তোমার দয়া সীমাহীন
তুমি রহীম তুমি রহমান
তুমি রাব্বুল আলামীন।

***

স্বদেশ

বিশ্বে মোট মসজিদ ২৫ লাখ

নগরী হিসাবে ঢাকায় সবচেয়ে বেশী মসজিদ

মুসলিম সমাজ আবর্তিত হয় মসজিদকে কেন্দ্র করে। ফলে যেখানেই মুসলমান আছে, সেখানেই আছে মসজিদ। মসজিদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বে মোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা গেছে।

দেশ অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী মসজিদ আছে ভারতে। সেখানে মসজিদের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। আর বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। দেশের আয়তনের সাথে সংখ্যার তুলনা করলে বাংলাদেশেই মসজিদের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। আর নগরী হিসাবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় রয়েছে সবচেয়ে বেশী মসজিদ। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর হিসাব অনুযায়ী, ঢাকায় মসজিদের সংখ্যা প্রায় ছয় হাযার। তবে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ইরাকের ফালুজা শহরকে মসজিদের নগরী হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সেখানে মসজিদের সংখ্যা দুই শতাধিক।

৬৫ বছর পর সীমান্তে ৭৫ বিঘা জমি উদ্ধার

দীর্ঘ ৬৫ বছর ভারতের দখলে থাকার পর চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপযেলার বেণীপুর সীমান্তবর্তী ৭৫ বিঘা বাংলাদেশী জমি অবশেষে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধার করা জমিতে সাদা নিশান টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত ৬৫ বিঘা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ১০ বিঘা জমিতে প্রবেশের অধিকার ফিরে পাওয়ায় সীমান্তবর্তী মানুষের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে।

বিজিবি ৬ ব্যাটালিয়ন চুয়াডাঙ্গার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এস এম মনিরুয্যামান এ সম্পর্কে জানান, অপদখলীয় এ জমি উদ্ধারে গত প্রায় চার মাস আগে কাজ শুরু করে বিজিবি। প্রয়োজনীয় দলীলপত্র সংগ্রহের পর ভারতের সীমানগরের ১৭৩ বিএসএফ কমান্ড্যান্ট অনিল শর্মার সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়। অবশেষে গত ২৯ জুন জমিটি দখলে নেওয়া সম্ভব হয়। পরে আড়াই লাখ টাকা খরচ করে জমিটি চাষের উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুহাম্মাদ. আবু সাঈদ জানান, উদ্ধার করা জমির মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ১০ বিঘা জমি কাগজপত্র যাচাইয়ের পর প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বাকি ৬৫ বিঘা সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত। ঐ জমিও শিগগিরই ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

দক্ষিণ তালপট্টি ভারতকে দিয়ে সমুদ্রসীমা ঘোষণা

দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানা হারিয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে এই দ্বীপের মালিকানা এখন ভারতের। নেদারল্যান্ডসের স্থায়ী সালিশী আদালত (পার্মানেন্ট কোর্ট অব আর্বিট্রেশন-পিসিএ) গত ৭ জুলাই এ রায় ঘোষণা করেন। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ এলাকা ছিল প্রায় ২৫ হাযার ৬০২ বর্গকিলোমিটার। এ এলাকার ১৯ হাযার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশ পেয়েছে। বাকি অংশ পেয়েছে ভারত। বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দক্ষিণ তালপট্টিকে ভারত তাদের বলে দাবী করলে দু'দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু ভারত নানাভাবে এ যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করে এবং দ্বীপটি অপদখলে নেয়। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ তালপট্টি ভারতকে দিয়েই সমুদ্রসীমা ঘোষণা করা হ'ল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রায়ের ব্যাপারে জানায়, এ বিজয় বন্ধুত্বের বিজয়; এটা দু'দেশের সাধারণ মানুষের বিজয়। আদালতের এ রায়কে স্বাগত জানিয়ে ভারত বলেছে, এই মীমাংসা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সৌহার্দ্য আরো জোরদার করবে।

তবে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা হারানোয় এই রায় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমুদ্র বিজ্ঞান ও ভূগোল বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুর রব বলেন, দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি রেকর্ডপত্রে বাংলাদেশের। একাত্তরের স্বাধীনতার আগে কিছু না বললেও স্বাধীনতার পর থেকে ভারত জোরপূর্বক তালপট্টি দখল করে রেখেছে। সালিশী আদালতে বাংলাদেশ নতুন অঞ্চল লাভ করলেও সরকারের ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও উদসীনতার কারণেই বঙ্গোপসাগরে তালপট্টি দ্বীপ হারাতে হয়েছে।

মেরিটাইম বিষয়ক সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবঃ) খুরশেদ আলম বলেন, ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর দ্বীপটি জেগেছিল। ১৯৮৫ সালে উড়িরচরে যে ঝড় হয়, তারপর থেকে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি আর নেই। ১৯৮৯ সালে স্যাটেলাইটের ধারণ করা ছবিতে এই দ্বীপটির অস্তিত্ব আর পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন, ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে যতগুলো মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে, তাতেই তো তালপট্টি নেই। রাজনৈতিক সীমারেখার মানচিত্র দেখিয়ে তিনি বলেন, এখানে কিন্তু তালপট্টি আমাদের না। ১৯৮০ সালের আগে যখন দ্বীপ ছিল তখন অবশ্যই দাবী করেছি। আমাদের কোন মানচিত্রেই আমরা প্রমাণ করতে পারিনি যে, জায়গাটা আমাদের। আমাদের নিজেদের মানচিত্রগুলো আগেই সংশোধন করা উচিত ছিল, কিন্তু করিনি। ২০১০ সালে যে মানচিত্র আমরা সংশোধন করেছি, আদালত তা গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন, দীর্ঘ চার বছর নয় মাস আইনী লড়াইয়ের পর এ চূড়ান্ত রায় হাতে পেল বাংলাদেশ। এ রায় আপিলযোগ্য নয়। এ রায়ের ফলে সমুদ্রে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে আমাদের বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে হবে।

বিদেশ

ঢাকা বিশ্বের ১১তম জনবহুল শহর

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর জাপানের রাজধানী টোকিও

বিশ্বের জনবহুল শহর হিসাবে জাপানের রাজধানী টোকিও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর পরই রয়েছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির নাম। তৃতীয় স্থানটি দখল করেছে চীনের সাংহাই। জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহরের তালিকায় ১১তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।

গত ১০ জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ বসবাস করে শহরে। ১৯৫০ সালে এর হার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। ভবিষ্যতে শহরমুখী মানুষের এই ঢল আরও বাড়বে। টোকিওতে বর্তমানে অন্তত তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষ বসবাস করে। ১৯৯০ সালে শহরটিতে ছিল তিন কোটি ২৫ লাখ ৩০ হাযার বাসিন্দা। নয়াদিল্লিতে বর্তমানে থাকে অন্তত আড়াই কোটি মানুষ। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯৭ লাখ ২৬ হাযার।

প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকায় বর্তমানে প্রায় এক কোটি ৬৯ লাখ ৮২ হাযার লোকের বসবাস। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৬৬ লাখ ২১ হাযার। সবচেয়ে বেশী নগরায়ণ হয়েছে উত্তর আমেরিকায়। সেখানে ৮২% মানুষ শহরে থাকে। এরপর রয়েছে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ (৮০%)।

বিশ্বের প্রথম জৈব দেশ ভুটান

অসাধ্য সাধন করতে চলেছে ভুটান। নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল পরিবেশ-বন্ধু ভুটানে ঘটতে চলেছে জৈব চাষের বিস্ফোরণ। অভিনব উদ্যোগ নিলেন প্রধানমন্ত্রী জিগমী থিনলে। জৈব চাষের উপকারিতা সম্পর্কে সে দেশই সঠিক বুঝবে, যার প্রধান পেশা কৃষি। হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশ ভুটান সেই সারমর্ম উদ্ধার করেছে। গত জুনের রিও প্লাস টুয়েন্টি বৈঠকে দেশজুড়ে জৈব চাষ প্রসারের ঘোষণা করেছেন থিনলে। ভুটান সরকার পরিচালিত প্রকল্পের নাম ন্যাশনাল অর্গ্যানিক পলিসি।

প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন ঘটানোই এর মূলমন্ত্র। উদ্দেশ্য রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও ফলনবৃদ্ধির স্প্রে ব্যবহার না করে দেশের মোট ৭ লক্ষ জনগণের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভুটানে মূলত ভুট্টা, চাল, ফল ও কিছু সবজি উৎপন্ন হয়। তাঁর মতে, ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা থাকায় এখানে শতভাগ জৈব চাষ সম্ভব। এখানে কৃষিই প্রধান পেশা। দেশের বেশির ভাগ জমিতেই কৃষিকাজে কখনও কোন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়নি। চাষবাসে এখনও প্রাচীন পদ্ধতিই প্রয়োগ হয়ে থাকে। উল্টো দিকে কৃত্রিম সার প্রয়োগ করে আশানুরূপ ফলনের অভাবে ভারতের কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রতি দিন বেড়ে চলেছে আত্মহত্যার প্রবণতা। তাই সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। সুস্থ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে ভুটানের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায়

শরী'আহ আদালত বৈধ

ভারতের মুসলমানদের জন্য পরিচালিত শরী'আহ আদালতকে বৈধ বলে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। গত ৭ জুলাই দেয়া ঐ রায়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, শরী'আহ আদালতের উপর কোন আইনী নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে আদালত এও বলেছে যে, তাদের ফৎওয়া মানতে কেউ আইনত বাধ্য নয়।

আদালত বলেছে, কোন ধর্মই কারো মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। কেউ স্বেচ্ছায় শরী'আহ আদালতের শরণাপন্ন হ'লেই কেবল ফৎওয়া জারী করা যাবে। তবে তা মানতে কেউ আইনত বাধ্য নয়।

বিশ্বলোচন মদন নামে দিল্লির একজন আইনজীবী দারুল ক্বাযা ও দারুল ইফতা'র মতো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শরী'আহ আদালতের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন। বিশ্বলোচন তার আবেদনে দাবী করেন যে, শরী'আহ আদালত অবৈধ। এই আদালত দেশের একটি উপ-আদালত হিসাবে মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তার মতে, মুসলমানদের এই মৌলিক অধিকারগুলো মুসলিম সংগঠনগুলোর নিয়োগকৃত কাযী ও মুফতীর দেয়া ফৎওয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করা যায় না।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেল সেতু হচ্ছে ভারতে

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু রেলসেতু তৈরী হচ্ছে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে। ইস্পাতের তৈরী এই রেলসেতুটি তৈরী করছেন দেশীয় প্রকৌশলীরা। হিমালয় পর্বতশৃঙ্গের চন্দ্রভাগা নদীর উপরে তৈরী হচ্ছে এই রেলসেতু। ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারের চেয়ে ৩৫ মিটার উঁচু হবে এই রেলসেতু। ভারতীয় রেলের এক কর্মকর্তা জানান, ১,১৭৭ ফুট উঁচু এবং ১,৩১৫ মিটার লম্বা এই রেলসেতুটি তৈরির কাজ ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে। এই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হ'লে জম্মু থেকে বারমুল্লা যেতে সময় লাগবে সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এখন একই জায়গায় যাতায়াতে সময় লাগছে ১৩ ঘণ্টা।

২০০২ সালে এই রেলসেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেতুর উচ্চতম স্থানে বিরূপ আবহাওয়ার কারণে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ২০০৮ সালে আবার নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। সেতুর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ভারতের কোঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশন। এতে মোট ২৫ হাযার টন ইস্পাত লাগবে। এই সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেলসেতুটি চীনের গুইঝাউ প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বেইপানজিয়াং নদীর ওপর নির্মিত। এটির উচ্চতা ২৭৫ মিটার। জম্মু ও কাশ্মীরের রেলসেতু চীনের চেয়ে ৮৪ মিটার উঁচু হবে।

মিজোরামে পুনরায় বৈধতা পেল মদ

প্রায় দুই দশক ধরে রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করে না কমেছে লিভারের রোগ, না কমেছে নেশাগ্রস্তের সংখ্যা। মাঝখান থেকে প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে মিজোরাম। পকেট ফুলেছে কালোবাজারীদের। মদের বিকল্প খুঁজতে বিভিন্ন ক্ষতিকর নেশার দিকে ঝুঁকেছে নতুন প্রজন্ম। অবশেষে তাই গির্জার তীব্র বিরোধ অগ্রাহ্য করেই 'ড্রাই স্টেট'-এর তকমা ফের ঝেড়ে ফেলল মিজোরাম। গির্জা ও সরকারের চরম বিরোধের মধ্যেই মদ বিক্রি আইনসিদ্ধ হ'ল রাজ্যে। বিল পেশ করা আবগারী মন্ত্রী লাল জিরলিয়ানা প্রেসবিটেরিয়ান স্বয়ং গির্জার সদস্য। তিনি নিজে এই বিল পেশ করার আগে স্থানীয় গির্জার গণপ্রার্থনায় অংশ নিয়ে যিশুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। তিনি বলেন, 'আমি ঈশ্বরকে বলেছিলাম তিনি সত্যিই বিলের বিরুদ্ধে থাকলে আমি যেন বৃহস্পতিবার বিল পেশ করতে না পারি। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আটকাননি। উপযুক্ত বয়সের মদ্যপায়ীদের ভাল মানের মদ দিতে চলেছি আমরা। মদে ভেজাল মেশালে বা বেআইনীভাবে মদ বিক্রি করলে, মদ খেয়ে গোলমাল বাধালে ও গাড়ি চালালে কড়া সাজা দেওয়া হবে'।

গির্জার চাপে ১৯৯৫ সালে 'মিজোরাম লিকর টোটাল প্রহিবিসন অ্যাক্ট' চালু হয়েছিল। কিন্তু মদ্যপান বন্ধ হয়নি। বরং পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে আনা মদ বহুগুণ বেশী দামে বিক্রি হ'তে থাকে। নেশার টানে মিজোরা বিভিন্ন বিকল্প সন্ধান শুরু করে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল চামড়া পচানো পানি। জারিত তামাকে ঘি মিশিয়ে তৈরী এক রকম নেশাদ্রব্যের প্রভাবে বহু তরুণ-তরুণী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। বিষ মদ পান করে বহু যুবকের মৃত্যুও হয়েছে।

তাই গির্জার নিষেধ না মেনেই নিষেধাজ্ঞা তোলার বিলটি বিধানসভায় পেশ করেন মন্ত্রী। ৪০ জন বিধায়কের মধ্যে ২৫ জন বিতর্কে অংশ নেন। তীব্র বাদানুবাদ ও ৬ জন বিরোধী বিধায়কের ওয়াক-আউটের পরে বিলটি পাশ হয়।

Contents

মুসলিম জাহান

বুর্জ খলীফা : একই ইমারতে ইফতারের তিন সময়

একই ইমারতে ইফতারের জন্য তিন রকম সময়? হ্যাঁ, দুবাইয়ের ১৬০ তলা এবং ২,৭২২ ফুট উচ্চতার পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ইমারত বুর্জ খলীফায় যারা বাস করেন, তারা তিন সময়েই ইফতার করেন।

এই উচ্চতার কারণেই সেখানে সময়ের এই হেরফেরটা হয়। অর্থাৎ ইমারতের নীচতলায় যখন সূর্য ডুবে, ১৬০তম তলায় ডুবে এর আরো তিন মিনিট পর। আবার সূর্য উঠার সময় ঘটে উল্টোটা- ১৬০তম তলায় তিন মিনিট আগেই সকাল হয়ে যায়। একই ভবনে সকাল-সন্ধ্যার এই হেরফেরের কারণেই সেখানে ইফতার ও সাহারীর সময়েও ব্যবধান।

দুবাই ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ফৎওয়া বোর্ডের সাবেক প্রধান আহমাদ আব্দুল আযীয আল-হাদ্দাদ বলেন, ভবনের উচ্চতার বিভিন্নতার কারণে বুর্জ খলীফার বাশিন্দারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইফতার, ফজরের ছালাত ও মাগরিবের ছালাত পড়বেন। এই ডিপার্টমেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৬০ তলাবিশিষ্ট এই ভবনটির ৮০ তলার উপরে যারা বসবাস করেন তারা নীচতলার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের দুই থেকে তিন মিনিট পর ইফতার আবার ২-৩ মিনিট পূর্বে সাহারী করবেন। উল্লেখ্য, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু এ ভবনটির নির্মাণে খরচ হয় দেড় হাযার কোটি মার্কিন ডলার।

চীনের জিনজিয়াংয়ে ছিয়াম পালনকারীদের জোরপূর্বক খাওয়ানো হচ্ছে

চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলটিতে সংখ্যালঘু উইঘুর সম্প্রদায়ের বাস। যাদের অধিকাংশই মুসলিম। সেখানে কয়েক বছর ধরে তাদের ছিয়াম রাখার উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এমনকি এ রামাযানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে জোর করে খাবার খাওয়ানোর অভিযোগ উঠেছে। সরকারী নিপীড়নের আশঙ্কায় ভুক্তভোগী ঐ শিক্ষার্থীরা তাদের নাম প্রকাশ করতে চায়নি। তাদের মধ্যে একজন বলেন, আমরা যে ছিয়াম রাখিনি, তা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের সঙ্গে খাবার খেতে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সনদ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। অতএব আপনি যদি এ অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবন চান, তাহ'লে ছিয়াম না রাখাই উত্তম।

এভাবে মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়াং অঞ্চলে কয়েক বছর ধরে মুসলমানদের ছিয়াম রাখার উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এবছর বিশেষভাবে জিনজিয়াংয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ছিয়াম পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, চীনের কমিউনিস্ট সরকার কোন ধর্মবিশ্বাসকেই সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু অত্যাচার চালায় বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর। সেখানে মুসলিমদের উপর চরম দমনাভিযান চলছে। কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে চরমপন্থী আখ্যায়িত করে চীনের নিরাপত্তা বাহিনী ধরপাকড়, গুম, হত্যা এবং বিনা বিচারে দীর্ঘ সময় আটকে রাখার কৌশল অবলম্বন করে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সার চিকিৎসায় ন্যানো কণা

ন্যানো কণা ধ্বংস করতে পারবে ক্যান্সার কোষ। বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক দল সম্প্রতি এ নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। চুম্বকের মাধ্যমে ন্যানো কণা প্রয়োগে টিউমারের কোষ আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে এতে ক্যান্সার-আক্রান্ত যেসব কোষ তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

এই পদ্ধতিতে ন্যানো কণা কোষের উপরে স্থাপন করা যা কোষের ভেতরে প্রবেশ করার মাধ্যমে তার জৈব অণুগুলো ভেঙে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানবদেহের ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হবে। বিশেষ করে কেমোথেরাপী ও রেডিওথেরাপীর বিকল্প হিসাবে ন্যানো কণার ব্যবহার মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যাপক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

৮ ঘণ্টার বেশি ঘুমে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে যায়

অতিরিক্ত ঘুমের কারণে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে যায় বলে নতুন এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়সীদের জন্য বেশী ঘুম অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে গবেষকেরা জানিয়েছেন। আবার কম ঘুমও ভালো নয় বলে তারা মনে করছেন। তারা বলেন, ৫০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক যেসব ব্যক্তি দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি বা ৬ ঘণ্টার কম ঘুমান, তাদের স্মৃতিশক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য ব্যাপকভাবে কমে যায়।

ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা প্রায় ৯ হাযার লোকের উপর সমীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। গবেষক ড. মাইকেল মিলার বলেন, বয়সের সাথে সাথে ঘুমের প্রয়োজনে পরিবর্তন আসে। যথাযথ ঘুমের মাধ্যমে কর্মশক্তি অটুট রাখা সম্ভব। তিনি বলেন, মস্তিষ্ককে সর্বোচ্চ মাত্রায় কর্মক্ষম রাখতে প্রতি রাতে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আরেক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, প্রতি রাতে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমে স্থুলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

লাখ লাখ মানুষের পুষ্টি জোগাবে নতুন আবিষ্কৃত 'সুপার কলা'

বিজ্ঞানীরা 'সুপার ব্যানানা' নামে প্রথমবারের মতো এক ধরনের উন্নতমানের কলা আবিষ্কার করেছেন। এ কলা সারা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা নতুন জাতের 'সুপার ব্যানানা'র পুষ্টিমান মানুষের উপর প্রথমবারের মতো পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার গবেষকেরা। এই কলায় আছে আলফা ও বেটা ক্যারোটিন। মানবদেহ এ দু'টিকে ভিটামিন 'এ'-তে রূপান্তরিত করে। বর্তমানে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন জীন উগাণ্ডায় পাঠানো হয়েছে, যা সেখানকার কলায় প্রবিষ্ট করানো হবে। ২০২০ সাল নাগাদ উগাণ্ডায় কৃষকেরা এ কলা উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান অধ্যাপক জেমস ডেল বলেন, প্রতি বছর ভিটামিন 'এ'-র অভাবে বিশ্বে সাড়ে ছয় থেকে সাত লাখ শিশু মারা যায়। তিন লাখ শিশু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হয়। এটি মানবদেহে ভিটামিন 'এ'-র মাত্রা কত দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তা জানা যেতে পারে।

প্রকল্প প্রধান আশা করছেন, এ বছরের শেষ নাগাদ তারা চূড়ান্ত ফল দেখতে পাবেন। সাধারণ কলার খাবার অংশ ক্রিম বর্ণের হ'লেও সুপার কলার এ অংশ কমলা রঙের। এতেই এর ভিটামিনসমৃদ্ধ অবস্থার বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সফরে আমীরে জামা'আত

গত ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার হ'তে ১২ই জুলাই শনিবার পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। ১০ই জুলাই সকাল ৫-টায় রাজশাহী থেকে বাস যোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সকাল ১১-টায় ঢাকা পৌঁছে তিনি সোনারগাঁয়ে স্বীয় জামাতার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চনে পৌঁছেন।

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার : বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কাঞ্চন এলাকার উদ্যোগে কাঞ্চন কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে তিনি যোগদান করেন। অতঃপর উক্ত সমাবেশে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে সমবেত মুছল্লীদেরকে নুযূলে কুরআনের এই মাসে সর্বাধিক তাক্বওয়া হাছিলের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নিকটে মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাক্বওয়া। ছিয়াম ফরয করা হয়েছে তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্যই। সেকারণ প্রকৃত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি কখনো কোন গর্হিত কর্মে লিপ্ত হ'তে পারে না। সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, দুর্নীতি ও পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ মারামারি থেকে মানুষকে পরহেয করতে পারে একমাত্র তাক্বওয়া। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন তাক্বওয়াভিত্তিক সমাজ গঠনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি সকলকে এই দাওয়াতী কাফেলায় শামিল হয়ে দ্বীনে হক প্রচারে সর্বোচ্চ আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

কাঞ্চন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল হাশেম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদ মিয়া, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সোহেল আহমাদ। অনুষ্ঠানে শফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও ছফিউল্লাহ খানকে সাধারণ সম্পাদক করে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কাঞ্চন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুমিন মাষ্টার ও ওমর ফারূক।

অতঃপর আমীরে জামা'আত স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব আব্দুছ ছবূর-এর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ঢাকায় আসেন এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকারের বাসায় রাত্রি যাপন করেন।

নয়াবাজার, ঢাকা ১১ জুলাই শুক্রবার : রাজধানীর বংশাল থানাধীন নয়াবাজারে অবস্থিত বায়তুল মামূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ জুম'আ থেকে আছর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা পেশ করেন।

অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আব্দুল হাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম।

বাদ আছর তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেইটে রামাযান উপলক্ষে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত বইমেলায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বুক স্টল' পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি কিছু সময় অবস্থান করেন। এ সময় বইমেলার বিভিন্ন স্টলের দায়িত্বশীলরা আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাতের জন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বুক স্টলে' ভীড় জমান। অতঃপর সেখান থেকে নয়াবাজারস্থ বায়তুল মামূর জামে মসজিদে পুনরায় ফিরে আসেন। বায়তুল মামূর জামে মসজিদে বাদ আছর হতে শুরু হওয়া আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন এবং শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। উল্লেখ্য, মাগরিবের ছালাতের পরও কিছু সময় তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন।

অতঃপর তিনি মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। সেখানে তারাবীহ ছালাত আদায়ের মাঝখানে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর মসজিদ কমিটির সদস্য আলহাজ্জ জালালুদ্দীন দেওয়ানের বাসায় গমন করেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন।

১২ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ ফজর মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত দরসে হাদীছ পেশ করেন। অতঃপর সকাল সোয়া ৭-টার ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের বিমান যোগে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বিমানে রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আমীরে জামা'আত তাকে মারকায পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানালেন তিনি বিমান থেকে নেমে সকাল ৯-টায় মারকায পরিদর্শনে আসেন। তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, আত-তাহরীক অফিস, আহলেহাদীছ আন্দোলন অফিস এবং মহিলা সালাফিইয়া মাদরাসা পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতকে ঢাকা বিমান বন্দরে বিদায় জানান ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব ফরীদ মিয়া।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন ভবন অবৈধ দখলমুক্ত

কুরআন শিক্ষা, দাওয়াহ সেন্টার ও লাইব্রেরী উদ্বোধন

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে বিরোধী পক্ষের সাথে আইনী লড়াইয়ের পর রাজশাহী মহানগরীর কাজলায় অবস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ৫তলা ভবনের দখল পেয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে

জামা'আত ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। ভবনটির দখল বুঝে পাওয়ার পর সেখানে কুরআন শিক্ষা, দাওয়া সেন্টার ও লাইব্রেরী উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ২৭ জুন শুক্রবার বাদ আছর অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর ভবনটি বুঝে পেয়ে মহান আল্লাহর বারগাহে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সুধী মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান কাজলায় হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল পার্শ্ববর্তী বিশাল বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-গবেষক-ছাত্ররা এখানে এসে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক গবেষণায় মনোনিবেশ করবেন এবং হক এর আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সংগঠন হতে বহিস্কৃত ও স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রের কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এক্ষণে আমরা আশা করছি যে, এই প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, যারা অন্যায় ভাবে দীর্ঘ এক যুগ ধরে ভবনটি দখল করে রেখে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছে এবং ভবনটির অপব্যবহার করেছে, এমনকি ছালাতের স্থানটিকে পর্যন্ত খেলার ঘরে রূপান্তরিত করেছে তারা উভয়জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উল্লেখ্য যে, সেখানে এখন থেকে নিয়মিত লাইব্রেরী ও পাঠকক্ষ খোলা থাকবে, প্রতি বুধবার বাদ আছর দাওয়াতী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে এবং সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য নিয়মিত কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, শিক্ষক শামসুল আলম, মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন' এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, কাজলা শাখা 'যুবসংঘ'র সভাপতি ও রাবি ৪র্থ বর্ষের ছাত্র সজীব ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ভবনটি নিয়ে বিগত ২০০৩ সালে এম.এন.জি.আর. ২/২০০৩ নং মামলার উদ্ভব হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর মামলা চলার পর রাজশাহী জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ দায়রা জজ আদলত-২ এর গত ২৩/০৫/২০০৭ তারিখের ফৌজদারী রিভিশন নং ৭৪/২০০৪ এর আদেশে আমীরে জামা'আতের পক্ষে রায় হয়। অতঃপর প্রতিপক্ষ আপীল করলে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ১০/০৫/১০ তারিখের রিভিউ পিটিশন নং ৮৪৪৪/২০০৭ এর আদেশে এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেড ডিভিশনের গত ১১/০৭/১৩ ইং তারিখের লিভ টু আপীল নং ৩২৫ এর আদেশে নিম্ন আদালতের আদেশকে বহাল রেখে আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে উক্ত ভবনের মালিক সাব্যস্ত করা হয়।

দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠিত এসব প্রশিক্ষণে কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে আমেলা সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্র মনোনীত প্রতিনিধিগণ। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

চট্টগ্রাম ৪ঠা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলার খুলশী থানাধীন ঝাউতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। উল্লেখ্য যে, একই সময় যেলার পতেঙ্গা থানাধীন স্টিল মিল বাজার সংলগ্ন নবনির্মিত বায়তুর রহমান সালাফী জামে মসজিদেও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঝাউতলা মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও বায়তুর রহমান জামে মসজিদে খুৎবা দেন অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ডা. শামীম আহসানকে সভাপতি ও শেখ সাদীকে সাধারণ সম্পাদক করে চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয় এবং দায়িত্বশীলদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

কক্সবাজার, ৫ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন বাহারছড়াস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব মুজীবুর রহমানের বাসায় এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠান শেষে কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয় এবং দায়িত্বশীলদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। কেন্দ্রীয় মেহমানগণ অনুষ্ঠান শেষে যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব সাবেরুল ইসলামের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং রাতের গাড়ী যোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে কক্সবাজার ত্যাগ করেন।

সিরাজগঞ্জ ৫ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন জগৎগাতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ আলী।

সিরাজগঞ্জ ১১ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে চরকুড়া (জামতৈল) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হুসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, আব্দুল মতীন, বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

নওহাটা, রাজশাহী ১২ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পবা উপযেলার উদ্যোগে নওহাটা গরুরহাট সংলগ্ন মার্কেটে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ শামসুল হুদা ও নামোপাড়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

মেহেরপুর, ১৫ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংনী থানাধীন সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাংঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুনীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক সা'দ আহমাদ প্রমুখ।

রাজশাহী-দক্ষিণ ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন তাহেরপুর হাইস্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-দক্ষিণ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আইয়ূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য জনাব সুলতান মাহমূদ, হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ, হাটগাঙ্গোপাড়া ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আতাউর রহমান, মাওলানা মীযানুর রহমান, আলমগীর হোসাইন ও আব্দুল বাকী প্রমুখ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদের এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক গিয়াছুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, মোহনপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা প্রমুখ।

সাহাপুর, পবা, রাজশাহী ১৮ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পবা থানাধীন সাহাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন পলাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ শামসুল হুদা এবং রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

(১) ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর-এর স্বনামধন্য সাবেক প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুল জলীল গত ১২ জুন সকাল ৭-টা ৪০ মিনিটে নিজ বাসভবনে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৪ কন্যা ও ১৩ জন নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। একই দিন বিকাল ৫-টা ৩০ মিনিটে তাঁর চতুর্থ পুত্র ছানাউল্লাহ্‌র ইমামতিতে জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ছেলেদেরকে অছিয়ত করে যান যে, মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে মাইকিং, কবরে খেজুরের ডাল পুতাসহ কোন ধরনের বিদ'আত যেন না করা হয়। তাই তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা হয়নি। তা সত্ত্বেও তাঁর জানাযায় অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাবেক সংসদ সদস্য ডাঃ মুরাদ হাসান, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর দক্ষিণ যেলার সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগরী, বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতীব মাওলানা উবায়দুল্লাহ উল্লেখযোগ্য। কামিল পাশ করার পর তিনি ০১.০৮.১৯৬৪ইং তারিখে আরামনগর কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিছ হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৮৭ সালে একই মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ যেলার শরীফপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাবুল মিয়া (৫৬) গত ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটায় মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ৫ কন্যা রেখে গেছেন। পর দিন ১১ জুলাই বিকাল ৫-টায় তার নিজ গ্রাম শরীফপুরে তাঁর জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : প্রচলিত হালখাতা প্রথা শরী'আত সম্মত কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান
কচাকাটা, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : হালখাতায় যদি গান-বাজনা বা কোন শরী'আত বিরোধী কাজ না করা হয়, কোন প্রকার প্রতারণা বা যুলুম না থাকে একমাত্র পাওনা টাকা আদায়ের লক্ষ্যে হয়, তাহ'লে তা বৈধ হবে। পরিশোধের লক্ষ্যে কর্য বা বাকী নিলে আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কর্য পরিশোধের আশায় কর্য গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে কর্য পরিশোধ করার সুযোগ দান করেন। আর যে ব্যক্তি এই আশায় কর্য গ্রহণ করে না, আল্লাহ তার কর্য পরিশোধের সুযোগ করে দেন না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯১০)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : ছালাতরত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় কি?

-রণি হক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উচ্চৈঃস্বরে নয়, অনুচ্চ শব্দে অথবা মধ্যম স্বরে কাঁদবে *(আ'রাফ ৭/২০৫; ইসরা ১৭/১১০)*। আর ছালাতে ক্রন্দন করা অধিক আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল লোকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৯)*। মুত্বাররিফ ইবনে শিখখীর স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং ফুটন্ত পানির ডেগের শব্দের ন্যায় কাঁদছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চাক্কীর শব্দের ন্যায় শব্দ করে কাঁদছিলেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০০০)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : অনেক ইসলামী সঙ্গীত সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গানের সুর ও ছন্দ নকল করে গাওয়া হয়। এরূপ নকলে কোন বাধা আছে কি?

-আমীর হামযা
শেরপুর, রায়পুরা, নরসিংদী।

উত্তর : নিজস্ব সুরে ইসলামী গান গাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এছাড়া পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ধর্মীয় কথা বা অশ্লীলতামুক্ত যে কোন কথা ছন্দাকারে গাওয়া জায়েয। এতে যদি কারু সুরের সাদৃশ্য হয়ে যায়, তাতে কোন দোষ নেই। দেখার বিষয় হ'ল গানের কথা ও মর্ম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এটি হ'ল কথা। এর সুন্দরটি সুন্দর এবং মন্দটি মন্দ' *(দারাকুৎনী হা/৪৩৫৯ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৮০৭)*। বনু কুরায়যার যুদ্ধের দিন নবী করীম (ছাঃ) কবি হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'হাস্‌সান! তুমি আমার পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি ব্যঙ্গ কবিতা বল'। তিনি আরো বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি হাস্‌সানকে কাফেরদের জবাব দেওয়ার জন্য জিবরীল-এর মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৮৯, 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা বলা' অনুচ্ছেদ)*। হাস্‌সান বিন ছাবিতের কবিতা আবৃত্তির জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রাখা হয়েছিল যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি কবিতা বলতেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫; 'মসজিদে কবিতা আবৃত্তি')*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : ছালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর পর কোন বয়স্ক মুরব্বীকে উক্ত স্থান ছেড়ে দিলে প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-এস,এম, আকাশ
আহমাদ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : পাবে। কেননা জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের সামনের কাতারে ধারাবাহিকভাবে দাঁড়ানোর কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। অতএব উক্ত হাদীছের প্রতি আমলের জন্য যদি কেউ কোন জ্ঞানী ও বয়স্ক ব্যক্তিকে সামনের কাতার ছেড়ে দিয়ে পেছনের কাতারে চলে আসে, তবে সে সামনের কাতারে ছালাত আদায়ের নেকী পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : ট্রাফিক জ্যামের কারণে অধিকাংশ সময় মাগরিবের ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করতে না পারায় আছরের সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করি। এটা সঠিক হবে কি?

-ফারযানা যামান
৩২ কামাল এভিনিউ, ঢাকা।

উত্তর : মাগরিবের ছালাত আছরের সাথে হবে না। তবে কোন সমস্যার কারণে অথবা সফরে মাগরিব-এশা একসাথে এবং যোহর-আছর একসাথে পড়া যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৩৯)*।

ছালাত জমা করার নিয়ম হ'ল, যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে জমা তাক্বদীম অথবা জমা তাখীর করা। অর্থাৎ শেষের ছালাত আগে এনে বা আগের ছালাত শেষে নিয়ে জমা করা। মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছর-এর ছালাত একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন যোহরকে বিলম্ব করে

Contents

যোহর ও আছর একত্রে পড়তেন। মাগরিবেও তিনি এরূপ করতেন। অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিব ও এশা জমা করতেন। আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও এশা জমা করে পড়তেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৮ পৃঃ, বিস্তারিত দেখুন : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : ছবিযুক্ত টাকা ও পরিচয়পত্র পকেটে রেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রাসেল মাহমূদ, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : যাবে। কেননা ওটা দেখা যায় না এবং সামনে বা পাশে টাঙানো থাকে না। *(বিস্তারিত দেখুন : 'ছবি ও মূর্তি' বই)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : কুরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণ করায় সমান নেকী অর্জিত হবে কি?

-ইশতিয়াক আহমাদ
বাবুইপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াত করলে অক্ষর প্রতি ১০ নেকী হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*। তবে আল্লাহ কুরআন মনোযোগ সহকারে শুনার জন্য আদেশ করেছেন। অতএব ছওয়াবের আশায় শুনলে ছওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়' (আ'রাফ ৭/২০৪)। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে এর বিনিময়ে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে' *(আন'আম ৬/১৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়..' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯/১৯৫৯)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে তার ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত হাদীছের সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহীম
গন্ধর্বপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, আবুল ফযল আল-মাক্বদেসী, ৩৯ পৃঃ, হা/৪০)*। তবে মসজিদে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়ারী কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। ওমর ফারূক (রাঃ) দুনিয়াবী কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য মসজিদে নববীর পার্শ্বে বুতাইহা নামক একটি চত্বর তৈরী করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি অনর্থক কথা, কবিতা পাঠ কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে চায়, সে যেন ঐ স্থানে চলে যায়' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৭৪৫)*।

হাসান বছরী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ মসজিদে দুনিয়াবী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না। তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন আবশ্যকতা নেই' *(বায়হাক্বী, শো'আব, মিশকাত হা/৭৪৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত ঐ-টীকা)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : সুন্নাত ছালাত আদায় রত অবস্থায় ফরয ছালাত শুরু হয়ে গেলে উক্ত মুছল্লীর জন্য করণীয় কি?

-ইকবাল শেখ, উত্তরখণ্ড, ভারত।

উত্তর : সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে ফরয ছালাতে যোগ দিবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের জন্য ইক্বামত দেয়া হ'লে উক্ত ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম হা/৭১০, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : আমাদের গ্রামে আযানের সময় মহিলারা মাথায় কাপড় দেয়। শরী'আতে এরূপ কোন বিধান আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
যুগীপাড়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : এরূপ কোন বিধান নেই। এর দ্বারা যদি কোন মহিলা বিশেষ ছওয়াব কামনা করে কিংবা ফেরেশতা দেখবে বলে মনে করে, তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত হবে। এসময় আযানের জওয়াব প্রদান করা ও শেষে আযানের দো'আ পাঠ করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : সুন্নাতে খাৎনার নিয়ম কিভাবে প্রবর্তন হয়? এর উদ্দেশ্য কি? এর নিয়ম-কানুনগুলি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-কাওছার আহমাদ হিমেল
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

উত্তর : হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্‌র হুকুমে এই সুন্নাত পালন করেছিলেন *(বুখারী হা/৬২৯৮, মুসলিম হা/২৩৭০, মিশকাত হা/৫৭০৩ 'সৃষ্টির সূচনা' অনুচ্ছেদ)*। আমাদের নবী (ছাঃ)ও এটি জারী রাখেন। খাৎনা দেওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি সকল নবীর সুন্নাত। হাদীছে একে ফিৎরাতে ইসলামের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে *(বুখারী 'গোঁফ কর্তন' অধ্যায় হা/৫৮৮৯)*। এর উপকারিতা হ'ল এতে লজ্জাস্থানে ময়লা জমে না, পেশাবের কোন অংশ তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না এবং এটি সহবাসের জন্য অধিক তৃপ্তিদায়ক *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৬০)*। আর এর নিয়ম-কানূন ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে এবং এটি মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকও বটে।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : সকল আসমানী কিতাব কি আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে?

-কাবীর
আড়ানী বাজার, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : সকল আসমানী কিতাব আরবী ভাষায় নাযিল হয়নি। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌র বিধান সমূহ ব্যাখ্যা করে বুঝাবার জন্য' *(ইবরাহীম ৪; আহমাদ হা/২১৪৪৮, ছহীহাহ*

হা/৩৫৬১)। সুতরাং তাদের নিকটে প্রেরিত কিতাবসমূহ সেই জাতির ভাষাতেই প্রেরণ করেছেন। যেমন তাওরাত হিব্রু ভাষায়, ইঞ্জীল সুরিয়ানী এবং কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৫২২)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : মাস্টার্স শেষ হওয়া উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'র‍্যাগ ডে' নামক যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এতে অংশগ্রহণ করা বা আর্থিকভাবে সাহায্য করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-ফারূক আযম, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : এটি অমুলিম কালচার থেকে আগত একটি অসভ্য প্রথা। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় পূর্ণ এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করা বা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-ওমর ফারূক
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁকে চুম্বন করেছিলেন *(বুখারী হা/১২৪১, ৪৪৫৫-৫৭, মিশকাত হা/১৬২৪)*। ওছমান বিন মায'ঊন (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে রাসূল (ছাঃ) কাঁদতে কাঁদতে তাকে চুম্বন করেছিলেন *(তিরমিযী হা/৯৮৯, সনদ ছহীহ)*। তবে মহিলাদের জন্য স্বামী এবং মাহরাম ভিন্ন অন্য কাউকে চুম্বন করা জায়েয নয়। এছাড়া পুরুষরাও স্ত্রী এবং মাহরাম ব্যতীত কাউকে চুম্বন করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, 'স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পক্ষে তাকে দেখা হারাম' মর্মে প্রচলিত এ কথাটি কুসংস্কার মাত্র। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে মৃত্যুর পর গোসল করাতে পারবে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২০৫-০৬, 'জানাযা' অধ্যায়; বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩ সনদ হাসান; ইরওয়া হা/৭০০)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : আমি সর্বদা পর্দার মধ্যে থাকি। এক্ষণে আমি মাথার সামনের চুল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কেটে সাইজ করে রাখতে চাচ্ছি। গৃহাভ্যন্তরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এভাবে চুল ছাটা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আতিয়া ফাওযিয়া আঁখি
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : গৃহাভ্যন্তরে নারী যেকোন সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারে। তাই বলে চুল কেটে সাইজ করা নয়। কেননা চুল লম্বা রাখাই মহিলাদের জন্য সৌন্দর্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারীকে আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : বোরক্বা না পরে ফুল হাতা কামীজ পরে মাথায় স্কার্ফ দিয়ে চলাফেরা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-হালীমা খাতুন, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কেবল ফুলহাতা কামীজ ও মাথায় স্কার্ফ দেওয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ পর্দা হয় না। বরং এতে শরীরের গড়ন প্রকাশ পায়। অতএব ঢিলাঢালা বোরক্বা পরে মাথায় বড় স্কার্ফ দিয়ে চলাফেরা করাই কর্তব্য *(বুখারী হা/৪৭৫৮, ফাৎহুল বারী ৮/৪৯০)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : একাধিক পোষাকের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি? যেমন একেক দিন একেক বোরক্বা পরিধান করা যাবে কি? এটা কি অপচয়ের মধ্যে গণ্য হবে?

-লিপি
রাজশাহী নার্সিং কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : প্রয়োজন ছাড়া এভাবে দৈনিক পোষাক পরিবর্তন করা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(ইসরা ২১১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও এবং যা খুশী পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দু'টি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাহ'ল অপচয় ও অহংকার *(বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮০-৮১ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : প্রচলিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমার কাছে দু'টাকা থাকলে এক টাকা দিয়ে খাদ্য ক্রয় কর আরেক টাকা দিয়ে ফুল ক্রয় কর। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-ওমর ফারূক
হায়দারপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন আমল করেছে, কিন্তু অন্য মানুষকে কখনো দ্বীনের দাওয়াত দেয়নি। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামের মূল দর্শন হ'ল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দান। মানব সমাজে আল্লাহ্র দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীছে মুসলিম উম্মাহকে জোরালো নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি যদি একটি আয়াতও কেউ জানে, তা প্রচার করার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে কারো পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। বরং কেউ যদি শারঈ ওযর ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যস্ততার অজুহাতে বা অলসতাবশতঃ তাবলীগ বা দ্বীনের প্রচার না করে, তাহ'লে

সে নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০, সনদ হাসান)*। তবে এর জন্য আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এমনটি নয়। কেননা একদিন ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম মুমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যে মুমিন আল্লাহ রাস্তায় জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। ছাহাবীগণ বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, যে মুমিন আল্লাহ্র ভয়ে পাহাড়ের কোন গুহায় আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে *(বুখারী হা/২৭৮৬, মুসলিম হা/১৮৮৮)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : আয়না দেখে কোন হারানো বস্তু বের করার বিষয়টি সমাজে প্রচলিত রয়েছে এবং তার বাস্তবতাও রয়েছে। এক্ষণে এতে বিশ্বাস করা যাবে কি?

-শামসুল আলম
চম্পুডাঙ্গা, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : যে ব্যক্তি আয়না চালক অথবা অনুরূপ কোন গণৎকারের নিকট যাবে এবং তার কার্যকলাপকে বিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে। জাদুর বাস্তবতা আছে। কিন্তু তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান হারানোর এবং কাফির হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন গায়েব সম্পর্কে সংবাদ দানকারী অথবা জ্যোতিষীর নিকট এসে সে যা বলবে তা বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মাদ-এর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার সাথে কুফরী করল' *(আহমাদ হা/৯৫৩২, ছহীহুল জামে' হা/৫৯৩৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবূল হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। অতএব এসবে বিশ্বাস স্থাপন করা বা এগুলি করে হারানো বস্তু খোঁজা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, গাছ-গাছড়া তাবীয হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে কুরআনের আয়াত তাবীয হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রহমান
নারায়ণজোল, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুরআনের আয়াত হৌক বা গাছ-গাছড়া হৌক সকল প্রকার তাবীয ব্যবহার করাই শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ আমার গলায় সুতা দেখে বললেন, এটা কি? আমি বললাম, 'সুতা' যা আমাকে পড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেটা ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহ্র পরিবার। তোমরা অবশ্যই শিরক হ'তে মুক্ত। আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক করা, কোন কিছু ঝুলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা সৃষ্টির জন্য যেকোন মাধ্যম অবলম্বন করা শিরক' *(আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। ঈসা ইবনু হামযাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইমের নিকট গেলাম। তখন তাঁর শরীরে লাল ফোসকা পড়ে আছে। আমি বললাম, আপনি তাবীয ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বলেন, ওটা হ'তে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলাবে, তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেওয়া হবে' *(তিরমিযী হা/২০০৫; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবীয কেটে দিল, সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পেল *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ফাতাওয়া উছায়মীন ৯/১৭৯)*। তবে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয। যেমন সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক্ব দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : উত্তর মেরুতে অবস্থিত সুইডেনের কিরুনা শহরে রামাযানের ১৫-২০ দিন সূর্যাস্ত হবে না। এক্ষণে এ অঞ্চলে অবস্থানকারী মুসলিমগণ কিভাবে ছিয়াম রাখবেন?

-রাকীব আহমাদ
রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : যদি কোন স্থানে সূর্য একেবারেই না ডুবে বা দিন-রাত্রির পার্থক্য সুস্পষ্ট না করা যায়, সেক্ষেত্রে সর্বনিকটবর্তী দেশ বা শহর যেখানে দিন-রাত্রির পার্থক্য স্পষ্ট করা যায় সেখানকার হিসাবে দিন-রাত্রি ভাগ করে ছিয়াম পালন করতে হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ১৫/২৯২/৩০০)*। দাজ্জালের আবির্ভাবের সময়ে তার প্রথম দিন বর্তমানের এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। বাকী ৩৭ দিন বর্তমান দিনের সমান হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করলে ছাহাবীগণ এক বছরের সমান দিনে ৫ ওয়াক্ত ছালাতই যথেষ্ট হবে কি-না জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, না বরং তোমরা এক দিনকে ভাগ করে নিয়ে ছালাত আদায় করবে' *(মুসলিম হা/২৯৩৭, তিরমিযী হা/২২৪০, আবুদাঊদ হা/৪৩২১)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : হারাম শরীফের এলাকার মধ্যে কোন মসজিদে ছালাত আদায় করলে হারামে আদায় করার নেকী পাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রাণা
মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : হারাম এলাকার অন্য মসজিদে উক্ত নেকী পাওয়া যাবে না। কারণ হাদীছে মসজিদুল হারাম বলতে মসজিদুল কা'বাকে বুঝানো হয়েছে *(মুসলিম হা/১৩৯৬, নাসাঈ হা/৬৯১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ছওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যায় না। সেগুলো হ'ল. মসজিদুল কা'বা, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্বছা' *(বুখারী হা/১১১৫; মুসলিম হা/১৩৯৭; মিশকাত হা/৬৯৩)*। মসজিদুল হারামের চত্বর যত বিস্তৃত হৌক, সকল মুছল্লী এক জামা'আতভুক্ত বলে গণ্য

হবেন এবং হারামে ছালাত আদায়ের নেকী পাবেন। পৃথক কোন স্থানে বা মসজিদে আদায় করলে সে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ তাতে স্থানিক ঐক্য থাকে না।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : রামাযান মাসে পূর্বে ছুটে যাওয়া এক ওয়াক্ত ক্বাযা ছালাত আদায় করলে কি ৭০ ওয়াক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় হয়ে যায়? এরূপ কোন হাদীছ আছে কি?

-রাহাত জামান, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ নেই। তবে রামাযান মাসে একটি ফরয আদায় করলে অন্য মাসে ৭০টি ফরয আদায়ের নেকী পাওয়া যায় মর্মে একটি হাদীছ এসেছে, যা যঈফ বা মুনকার *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৫, সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৭১)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : এশার পরে নফল ছালাত আদায় করতে চাইলে তা কি বিতর ছালাতের পূর্বে না পরে পড়তে হবে?

-রাহাত যামান, বগুড়া।

উত্তর : বিতর ছালাতের পূর্বে সকল নফল ছালাত শেষ করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রাতের শেষ ছালাত হিসাবে বিতর আদায় কর' *(বুখারী হা/৯৯৮, মুসলিম হা/৭৫১, মিশকাত হা/১২৫৮)*। তিনি বলেন, 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে' *(বুখারী হা/৯৯০; মিশকাত হা/১২৫৪)*। তবে ঘুম না ভাঙ্গার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম ভাগে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে সেটাই তার রাত্রির নফল ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : অমুসলিমের রক্ত মুসলমানের দেহে প্রবেশ করানো যাবে কি? এছাড়া অমুসলিমকে রক্তদানে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : যরূরী অবস্থায় অমুসলিমের রক্ত কোন মুসলমানের দেহে প্রবেশ করানোতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। মুশরিকগণ আক্বীদাগত তথা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে অপবিত্র *(তওবা ৯/২৮)*, কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে নয়। এছাড়া অমুসলিমদের রক্ত দান করতেও কোন বাধা নেই। বরং মানুষ হিসাবে মুসলিম-অমুসলিম তথা সকল মানুষের প্রতি উদার সহযোগিতাই ইসলামের শিক্ষা।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : পাখির গোশত ভক্ষণের ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশনা কি? কোয়েল পাখির গোশত বা ডিম খাওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-মেহেদী, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু এবং ধারালো নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫)*। অতএব হাঁস, মুরগী, তিতির, হুদহুদ, রাজহাঁস, বক, সারস, উটপাখি, ময়ুর, চড়ুই, কোয়েল, ঘুঘু, কবুতর, পানকৌড়ী ইত্যাদি পাখি প্রজাতির প্রাণী ভক্ষণ করায় কোন বাধা নেই। কেননা এগুলি নখ দিয়ে শিকার করে না। পক্ষান্তরে যেসব শিকারী পাখি থাবা বা নখর দিয়ে শিকার করে সেসব পাখি যেমন- ঈগল, চিল, শকুন, কাক, পেঁচা, বাজ পাখি ইত্যাদির গোশত ও ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর নিয়ম জানতে চাই। এ সময় পৃথকভাবে কুলুখ ব্যবহারের কোন বিধান শরী'আতে আছে কি?

-আব্দুল আউয়াল
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : মাইয়েতকে গোসল দেয়ার সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ শালীনতা ও পরহেযগারীর সাথে কুলপাতা দেওয়া পানি অথবা সুগন্ধি সাবান দিয়ে গোসল করাবে। সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবে। পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে গোসল করাবে। তবে মহিলাগণ শিশুদেরকে গোসল করাতে পারবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬৮)*। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫; বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান)*।

গোসলের সময় গোসলদানকারী প্রথমে একটি কাপড় দিয়ে মাইয়েতের সতর ঢেকে দিবে এবং তার শরীরের পরিধেয় কাপড়গুলো খুলে ফেলবে। এরপর পেটে হালকাভাবে চাপ দিবে, যাতে কিছু থেকে থাকলে বেরিয়ে যায় এবং হাতে একটি ভিজা ন্যাকড়া পেঁচিয়ে নিয়ে লজ্জাস্থানের দিকে না তাকিয়ে তা পরিষ্কার করে দিবে। এরপর 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূর অঙ্গ সমূহ ধৌত করাবে। তারপর তিনবার বা তার বেশী বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। গোসল শেষে সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দিবে। অতঃপর তিনটি ভাগে বেনীবদ্ধ করে পিছনে ছড়িয়ে দিবে *(বুখারী হা/১২৬৩; মুসলিম হা/৯৩৯; আবুদাঊদ হা/৩১৪২, ৩১৪৫; মিশকাত হা/১৬৩৪; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ২২৭)*।

মৃতব্যক্তিকে পৃথকভাবে কুলুখ করানোর কোন বিধান নেই। বরং পানি দ্বারাই সবকিছু করতে হবে। পানির অবর্তমানে কুলুখ ব্যবহার করা যাবে। ইমাম তিরিমিযী বলেন, বিদ্বানগণ (পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে) পানিকেই যথেষ্ট মনে করেন। পানি না পেলে কুলুখ নিবে *(তিরমিযী হা/১৯ আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : কুরআনের আরবী শব্দাবলী বুঝার জন্য বাংলা অক্ষরে উচ্চারণ করে লেখা যাবে কি? এছাড়া অন্য ভাষাতে লেখা যাবে কি?

-রাকীবুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উচ্চারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা সহজে বুঝার জন্য এরূপ লেখায় কোন বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আয়াতের উচ্চারণ ও মাখরাজের বিশুদ্ধতার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং উস্তাদের নিকট মাশক্ব করতে হবে। নতুবা ভুল উচ্চারণে অর্থের পরিবর্তন ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, সূরা ইয়াসীনের ২১ নং আয়াত অনুযায়ী বিনিময় নিয়ে ছালাত আদায় করানো ইমামের পিছনে ছালাত হবে না। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-আরাফাত হোসাইন
রংপুর।

উত্তর : কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করেননি *(ফুরক্বান ৫৭)*। ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হ'লে তার দায়িত্বের বিনিময়ে সম্মানজনক রূযীর ব্যবস্থা সমাজকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি, আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয়, তবে তা খেয়ানত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, হা/ ৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : টিভি, রেডিও বা মোবাইলে সিজদার আয়াত শ্রবণ করলে সিজদা করা যরূরী হবে কি?

-ইশতিয়াক আহমাদ
বাবুইপাড়া, গোদাগাড়ী, বগুড়া।

উত্তর : এমতাবস্থায় সিজদা দেওয়া উত্তম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত পড়তেন এবং আমরা তাঁর নিকটে থাকতাম তখন তিনিও সিজদা করতেন আমরাও সিজদা করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০২৫, 'তেলাওয়াতে সাজদাহ' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) সূরা নাজম তেলাওয়াতের সময় সিজদা করলে তার সাথে মুসলিম, মুশরিক, জিন ও ইনসান সবাই সিজদা করেছিল *(ছহীহ বুখারী হা/১০৭১, মিশকাত হা/১০৩৩)*। তবে এটি যরূরী নয়। কেননা যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা না করলে রাসূল (ছাঃ)ও সিজদা দেননি *(আবুদাউদ হ/১৪০৪; তিরমিযী হা/৫৭৬)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের ইক্বামতের পূর্বে ইমাম ছাহেব কাতার সোজা করা, পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলানো এবং ইক্বামতের জবাব দানের জন্য মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানান। এটা কি শরী'আতসম্মত?

-জালালুদ্দীন, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ইকামতের পূর্বে নয়; বরং পরে পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে বলতেন। কিন্তু এ সময় ইকামতের জবাব দিতে বলতেন মর্মে দলীল পাওয়া যায় না। তবে আযান ও ইক্বামত দু'টিকেই যেহেতু হাদীছে আযান বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেহেতু ইক্বামতেরও জবাব দিতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর, আমি তোমাদেরকে পিছন থেকে দেখতে পাই'। তিনি (আনাস) বলেন, আমরা কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম' (বুখারী, হা/৭২৫)। আবু শাজারা বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর। তোমরা সারিবদ্ধ হও, ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ হওয়ার মত। তিনি আরও বলেন, তোমরা কাঁধ সামনা-সামনি কর। মধ্যের ফাঁকা বন্ধ কর। শয়তানের জন্য ফাঁকা ছেড়ে দিয়ো না। যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতারের মধ্যের ফাঁকা বন্ধ কর। কেননা শয়তান কালো বকরীর বাচ্চার ন্যায় তোমাদের কাতারের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১১৩১)*। উদ্ধৃত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধ প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিতেন।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : খুৎবার আযান মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে মাইকে দেওয়া যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ক্বামারুযযামান
সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদের বাইরে কোন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হ'ত। উদ্দেশ্য ছিল, দূরে আযানের আওয়াজ পৌঁছানো। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) বানু নাজ্জারের এক মহিলা হ'তে বর্ণনা করেন, মসজিদের নিকটে আমার বাড়িই সর্বাপেক্ষা উঁচু ছিল। বেলাল তার উপরে উঠে ফজরের আযান দিতেন *(ছহীহ্ আবুদাঊদ হা/৫১৯, সনদ হাসান)*। অতএব মাইক থাকলেও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া উত্তম। অবশ্য সুবিধামত স্থানে দাঁড়িয়ে মাইকে আযান দেওয়ায় বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : কবর খনন করার পদ্ধতি ও ফযীলত এবং লাশ রাখার নিয়ম বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আরীফুল ইসলাম
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : কবর খনন করা নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। এজন্য ঐ ব্যক্তি অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'নেকীর কাজে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর...' *(মায়েদাহ ২)*।

কবর প্রশস্ত, গভীর ও সুন্দর হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

Contents

এরশাদ করেন, 'তোমরা কবর খনন কর এবং প্রশস্ত, গভীর ও সুন্দর কর' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৩, সনদ ছহীহ, 'জানাযা' অধ্যায়)*। গভীরতার পরিমাণ সম্পর্কে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্তে একটি রেওয়ায়াত এসেছে, যেখানে মানুষের দৈর্ঘ্য পরিমাণ গভীর করতে বলা হয়েছে। ইমাম শাফেঈও সেকথা বলেন। খলীফা ওমর ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) থেকে 'নাভী' পর্যন্ত গভীর করার কথা এসেছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া 'বুক' পর্যন্ত বলেন। তিনি বলেন, এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল যাতে লাশ ঢাকা পড়ে এবং হিংস্র জন্তু থেকে হেফাযত হয়। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, কবরের গভীরতার কোন সীমা নেই' *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/৯৪ পৃঃ)*। উপরের আলোচনা শেষে বলা চলে যে, কবর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, গভীর, প্রশস্ত, সুন্দর ও মধ্যস্থলে বিঘত খানেক উঁচু করে দু'দিকে ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিক উঁচু করা নাজায়েয। 'লাহদ' ও 'শাক্ব' দু'ধরনের কবর জায়েয আছে। যাকে এদেশে যথাক্রমে 'পাশখুলি' ও 'বাক্স কবর' বলা হয়। তবে 'লাহদ' উত্তম।

মাইয়েতকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পুরুষদের। মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তীগণ ও সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিগণ এই দায়িত্ব পালন করবেন, যিনি পূর্বরাতে (বা দাফনের পূর্বে) স্ত্রী সহবাস করেননি। পায়ের দিক দিয়ে মোর্দা কবরে নামাবে (অসুবিধা হ'লে যেভাবে সুবিধা সেভাবে নামাবে)। মোর্দাকে ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে। এই সময় কাফনের কাপড়ের গিরাগুলি খুলে দেবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৯৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯০)*।

কবরে শোয়ানোর সময় *'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ'* (অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র রাসূলের দ্বীনের উপরে') বলবে। এই সময় কোন সুগন্ধি বা গোলাপ পানি ছিটানো বিদ'আত। কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে (বিসমিল্লাহ বলে) তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দেবে। এ সময় *'মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' (ত্বোয়াহা ২০/৫৫)* পড়ার কোন ছহীহ দলীল নেই *(আহমাদ হা/২২২৪১, সনদ যঈফ)*। অনুরূপভাবে *আল্লা-হুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্বা-নি ওয়া মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে...* পড়ার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৩, সনদ যঈফ)*।

দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' অর্থাৎ মুনকার ও নাকীর (দু'জন অপরিচিত ফেরেশতা)-এর সওয়ালের জওয়াব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলের দো'আ করা উচিত। যেমন এ সময় *'আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু'* (অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন') বলবে *(আবুদাঊদ হা/৩২২১)*। এছাড়া আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ার হামহু.. মর্মে বর্ণিত দো'আটিও পড়তে পারে *(মুসলিম হা/৩৩৬)*। কিন্তু দাফনের পরে একজনের নেতৃত্বে সকলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা ও সকলের সমস্বরে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৩০-৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : সরকার বর্তমানে মালয়েশিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। এমতাবস্থায় চোরাইপথে সেখানে গিয়ে অর্থ উপার্জন করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-ফয়ছাল আহমাদ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : চোরাইপথে উপার্জন করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ। কেননা শরী'আতবিরোধী না হ'লে যে কোন রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুসরণ করা জনগণের উপর অবশ্য কর্তব্য *(নিসা ৫৯)*। অতএব রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা ভঙ্গ করে চোরাইপথে মালয়েশিয়া গিয়ে অর্থ উপার্জন করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : সন্তান প্রসবকালীন সময়ে কোন মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তিনি কি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন?

-মাযহার হোসাইন
রায়গঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : হ্যাঁ। সন্তান প্রসবকালীন সময়ে কোন মুমিন মহিলা মারা গেলে শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন *(আহমাদ হা/২২৭৩৭; মিশকাত হা/১৫৬১)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : ছিয়াম অবস্থায় অনেক মানুষ এমনকি কোন কোন আলেমও দাঁতে গুল দেন এবং বলেন এতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আসীফ
পাকুড়, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর : তামাক বা তামাকজাত যে কোন দ্রব্য, যা দেহের মধ্যে খাদ্যের ন্যায় তৃপ্তি যোগায়, তা খাদ্য হিসাবে গণ্য হবে। যেমন গুল, জর্দা, বিড়ি-সিগারেট সহ সকল প্রকার নেশাদার দ্রব্য। এছাড়া গুল মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা খাওয়া বা ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : কোন হাদীছে এসেছে ক্বিয়ামতের দিন মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় এবং কোন হাদীছে এসেছে যে কাপড়ে দাফন হবে সে কাপড়ে পুনরুত্থিত হবে। উভয় হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কি?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তর : ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে বস্ত্রহীন অবস্থাতেই পুনরুত্থিত করা হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৩৬)*। কোন হাদীছে বলা হয়নি যে, কাফন পরা অবস্থায় উঠবে। কেবল

একটি হাদীছে এসেছে, প্রত্যেক বান্দা যে অবস্থায় মারা যাবে তাকে সে অবস্থায় উঠানো হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৫)*। এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, দুনিয়াতে ভালো কর্ম করে মারা গেলে ভালো অবস্থায় আর মন্দ কর্ম করে মারা গিয়ে থাকলে মন্দ অবস্থায় উঠবে *(মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর ২/৪৪০)*। যেমন বলা হয়েছে, ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তাকে তালবিয়াহ পাঠ করা অবস্থায় উঠানো হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : কুরবানীর বকরী ক্রয়ের কিছুদিন পর বকরীর পায়ের খুর বড় হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাটে। এমতাবস্থায় পায়ের ক্ষুর কাটা যাবে কি? অথবা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় কুরবানী জায়েয হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শহীদুল্লাহ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : পশুর চলাফেরা যদি কষ্ট মনে হয়, তবে পায়ের বর্ধিত ক্ষুর কাটা দোষণীয় নয়। তাছাড়া নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরনো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তবে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী জায়েয হবে *(মির'আত ২/৩৬৩; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭৩৮ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুন : মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি?

-মিলন হোসাইন
নাটোর ডিগ্রী কলেজ, নাটোর।

উত্তর : কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৭১)*। তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করালেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৩১; আত-তাহরীক, অক্টোবর '০১, ১৪/৮৬)*।

ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সঊদী আরব গমন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ১৬ই জুলাই বুধবার বিকাল ৫-টার ফ্লাইটে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে সঊদী আরব গমন করেছেন। সফরসঙ্গী হিসাবে আছেন আমীরে জামা'আতের মেজ ছেলে ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব। বিমানবন্দরে তাঁদেরকে বিদায় জানান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগের ম্যানেজার আব্দুল বারী ও ঢাকা লালমাটিয়া কলেজের অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম। তাঁরা সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** শনৈঃশনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্‌হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।
২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।
৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।
৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।
৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।